প্রথম প্রকাশ: ১৫ নভেম্বর ১৯৭১

সংবাদ বিচিত্রা
SANGBAD BICHITRA

ONLY OFFICIAL NEWSPAPER OF CAB

প্রকাশনায়: বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘ | CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL | NORTH AMERICA

Periodical Issue: 468 | April 2021 | USPS No: 020877 | ISN: 1542 5657

৪৮ তম বর্ষ | চৈত্র-বৈশাখ ১৪২৭-২৮ | এপ্রিল ২০২১ | visit our website : www.cabusa.org

সরকারি নজরদারি এড়িয়ে কালোবাজারি ১ লক্ষ ৮০ হাজারেও বিক্রি হচ্ছে রেমডেসিভির

পারিজাত বন্দ্যোপাধ্যায়

বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো একেই বলে!

জটিল করোনার প্রাণদায়ী ওষুধ 'রেমডেসিভিয়ার'-এর জোগান স্বাভাবিক রাখতে সরকার নিয়মকানুন যত কড়া করছে, ততই নিয়মের ফাঁক গলে তার কালোবাজারি তুঙ্গে উঠছে। এমনিতে এর ছ'টি ভায়ালের দাম ৩৪০০-৫৪০০ টাকা। কিন্তু অসহায় মানুষের কাছে এক-একটি ভায়ালের জন্য ২৫-৩০ হাজার টাকা দাম হাঁকছেন দালালেরা। ছ'টি ভায়ালের জন্য কোথাও নেওয়া হচ্ছে এক লক্ষ ২০ হাজার টাকা, কোথাও বা দেড় লক্ষ বা এক লক্ষ ৮০ হাজার! প্রিয়জনের প্রাণ বাঁচাতে মরিয়া অনেকেই যেনতেন প্রকারে সেই টাকা জোগাড় করে ওষুধ কিনছেন, অনেকে আবার টাকা দিয়ে প্রতারিতও হচ্ছেন।

প্রশ্ন উঠছে, ওষুধের অযৌক্তিক ব্যবহার বন্ধ করে জোগান স্বাভাবিক রাখতেই তো রেমডেসিভিয়ারের উপরে নিয়মকানুন আরোপ হয়েছে। নজরদারি চালাচ্ছে স্বাস্থ্য দফতর এবং ড্রাগ কন্টোল। গৃহ-নিভৃতবাসে থাকা রোগীদের এই ওষুধ ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছে। তা হলে ওষুধের জন্য হাহাকার কমার বদলে বাড়ছে কেন? সর্বোপরি রোগীর স্বজনদের দিয়ে এই ওষুধ কেনানোর কথাই নয়। সরকারের নির্দেশ, উৎপাদক সংস্থার থেকে বেসরকারি হাসপাতাল নিজেরা রেমডেসিভিয়ার কিনবে। তা হলে রোগীর আত্মীয়স্বজনকে তা হন্যে হয়ে খুঁজতে হচ্ছে কেন?

একটাই উত্তর। চাহিদার তুলনায় জোগান কম। দেশে মাত্র ছ'টি সংস্থা রেমডেসিভিয়ার উৎপাদন করে। তার বেশির ভাগই মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, মধ্যপ্রদেশের মতো রাজ্যে চলে যাচ্ছে। সংক্রমণ তুঙ্গে ওঠায় পশ্চিমবঙ্গেও বহু মানুষের ওই ওষুধ দরকার। কোনও হাসপাতাল ১০০ ভায়াল চাইলে স্বাস্থ্য দফতর বা ড্রাগ কন্টোল তাদের ৩০টির অনুমোদন দিচ্ছে। ধরা যাক, কোনও

এরপর ৯ পাতায় ▶

২০২১মার্চ সংখ্যায় পবিত্র চৌধুরীর একটি লেখা প্রকাশিত হয়ছিল,তার সমস্ত ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি তার নিজস্বই। কারও অনুভূতিতে আঘাত পেলে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত ।

CONTRACT SIGNED WITH PLANET HOLLYWOOD, LAS VEGAS, FOR NABC 2022

NABC GLOBAL

BEYOND BORDERS

NABC GLOBAL

Biggest International Bengali Conference

VIRTUAL

2021: JULY 2,3,4

: Introductory Brochure :

AN INITIATIVE OF CAB NABC : USA

Please see pages 2, 12, 13, 23 & 24 for more NABC GLOBAL INFORMATIONS

বঙ্গ সম্মেলনের খবর

NABC 2021 : GLOBAL DIGITAL CONFERENCE
Organized By: Cultural Association of Bengal
Date : July 2,3 &4. 2021

NABC 2022:
Organized By: Cultural Association of Bengal
Las Vegas, NV. July 1,2 & 3, 2022
Chairman: Kali Pradip Chowdhury,
Convener: Milan K Awon
Emeritus Coordinator: Prabir Roy

NABC 2023 :
Organized By: Prabasi, Massachusetts
Chairperson : Indra Deb
Details will be published later

NABC 2024 :
Organized By: Bengali Association of Greater Chicago,
Chairperson: Indranil Roychaudhury
Details will be published later

২০২১ এনএবিসি গ্লোবাল – সীমানা ছাড়িয়ে

কিছু তারকাদের এক ঝলক

এনএবিসি ২০২১ মার্কেটিং ও কম্যুনিকেশন

উত্তর আমেরিকান বাঙালী সম্মেলন (এনএবিসি) – 'বঙ্গ সম্মেলন' নামে যেটি পরিচিত - এটি সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বজুড়ে প্রত্যেককে বিনোদন দেওয়ার জন্য ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (ভিআর) প্ল্যাটফর্মে আসছে। সব অনুষ্ঠান যাতে সহজে সবার কাছে পৌঁছে যায় তার জন্যে সব নির্দেশাবলী দেওয়া হবে। অনুগ্রহ করে ২, ৩ ও ৪-ই জুলাই আপনারা পুরো ফাঁকা রাখুন। দূরে যাওয়ার ব্যাপার নেই, কোনও হোটেল বুকিং নেই, কোনও ঝামেলা নেই, কেবল একটি স্মার্ট ফোন, ট্যাবলেট বা কম্পিউটার দরকার। আপনার বাড়িতে বা যেখানে আপনি গ্রীষ্মের এই তিনটি দিন কাটানোর পরিকল্পনা করবেন সেখানে বসে সব উপভোগ করুন !

এনএবিসি কমিটি একাধিক মহাদেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, মধ্য প্রাচ্য, ভারত, বাংলাদেশের মতো অনেক দেশ থেকে অংশগ্রহনের আশা করছে। সেলিব্রিটি টক শো, শিক্ষা মেলা, শিল্প প্রদর্শনী এবং আরও অনেক অভিজ্ঞতা হবে। এছাড়াও ট্রেড শো, প্রদর্শনী, ব্যবসায়িক নেটওয়ার্কিং এবং বিনিয়োগের সুযোগ থাকবে। স্পনসররা তাদের ব্র্যান্ড এবং পণ্য প্রচার করে ডায়াস্পোরার কাছে পৌঁছানোর জন্য এই গ্লোবাল ভার্চুয়াল সম্মেলনটি কাজে লাগাতে পারবেন।
এখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কিছু ঝলক দেওয়া হল। আরও অনেক অনুষ্ঠান থাকবে আশা করা হচ্ছে।

সহজিয়া রবি - কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য সৃষ্টির ওপর ভিত্তি করে - শান্তিনিকেতন থেকে সরাসরি আপনার পর্দায় আসবে। অন্তরা দাস পরিচালিত এই বিভাগে পার্বতী বাউল, কার্তিক দাস বাউল, মনোজ মুরালি এবং অদিতি গুপ্তের দুর্দান্ত পরিবেশনা থাকবে –যা দেখার পর আপনার প্রাণ ভরিয়ে দেবে।

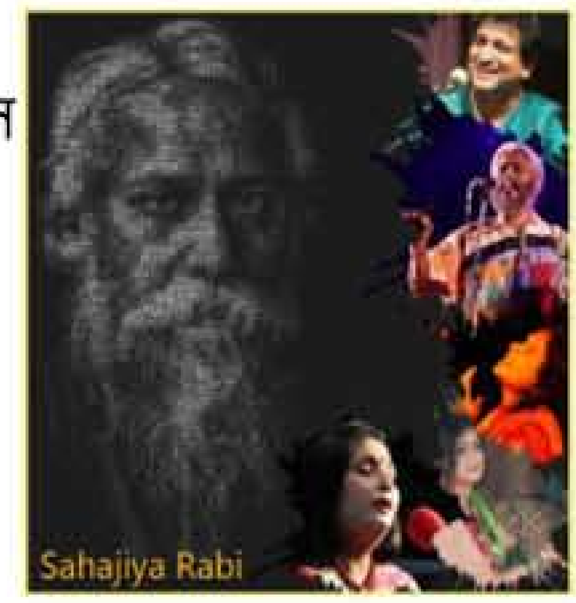

কিন্নরী গাঁথা - কিছু বাস্তব জীবনের গল্প নিয়ে একটি অনন্য প্রযোজনা - মৌবানি সরকার, অভিরূপ সেনগুপ্ত এবং তাঁর দল, নাট্য পরিবেশনায় সত্যিনাথ মুখোপাধ্যায়, কথা ও গানে থাকবেন রিদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডঃ দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ক্যাকটাস - বিখ্যাত বাংলা ব্যান্ড একটি চাঞ্চল্যকর উপস্থাপনা করতে চলেছে। আপনারা অনেকেই সম্ভবত মন বা হলুদ পাখির মতো কয়েকটি গানের শিরোনামের কথা মনে করতে পারেন।

অন্বেষা দত্তগুপ্ত, দুর্নিবার এবং প্রাঞ্জল করবেন **হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরী, এসডি বর্মণ আর আরডি বর্মণের** মতো সংগীত পরিচালক প্রযোজিত বাংলা আধুনিক গানের একটি সৃজনশীল মিশ্রণ।

২০২০-২১ সিরিজের দুটি চূড়ান্ত প্রতিযোগী সহ সারেগামাপা-এর কয়েকজন তারকা **'স্বর্ণযুগের গান'** উপস্থাপনা করবেন। আমি নিশ্চিত এই বিভাগটি আপনারা ভীষণ উপভোগ করবেন।

জয়তি চক্রবর্তী এবং প্রত্যুশ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি **রাবীন্দ্রিক সংকলন** উপস্থাপন করবেন যা আপনি কেবল উপভোগই করবেন না, বাঙালি হিসাবে গর্বিতও বোধ করবেন।

তিনদিনের অনুষ্ঠানে আরও অনেক কিছু থাকবে।

এনএবিসি গ্লোবাল - সীমানা ছাড়িয়ে আপনাকে অন্যবারের বঙ্গ সম্মেলনের মতো একটি অভিজ্ঞতা দেওয়ার জন্য তৈরী হতে চলেছে। যে কোনও বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য রেজিস্ট্রেশন - নিয়মিত অংশগ্রহনকারী, স্পনসর, ডোনর, এক্সহিবিটর, পার্টনার সংগঠন - সবই পাবেন www.nabcglobal.org ওয়েবসাইটে।

বিশ্বজুড়ে সমর্থন এবং অংশগ্রহনের মধ্য দিয়ে আমরা সমস্ত প্রতিবন্ধকতা ভেঙে ফেলতে পারি এবং সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ ও মজাদার পুরো তিনটি দিন উপভোগ করতে পারি। আসুন এই প্রচেষ্টায় সবাই একসাথে এগিয়ে আসি।

বি.দ্র. এই প্রতিবেদনে দেওয়া তথ্য এবং বিবৃতিগুলি কেবল উত্তর আমেরিকান বাঙালী সম্মেলনের নীতি, নির্দেশিকা এবং মতামতকে উপস্থাপন করে। বিস্তারিত জানতে ***www.nabcglobal.org*** *দেখুন, ইন্সটাগ্রাম-এ #nabcglobal অনুসরণ করুন বা আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে* ***info@nabcglobal.org*** *এ যোগাযোগ করুন।*

বঙ্গ সংস্কৃতি সঙ্ঘের
EXECUTIVE COMMITTEE

President
Chitta Saha
chittasaha@Hotmail.com
Vice-President
Tapas Sanyal
tsanyal@Verizon.net
Dipayan Sarkar
d_Sarkar@yahoo.com
Debasis Adhikari
debasisa@gmail.com
Secretary
Debiprosad Palit
Asstt. Secretary
Partha S. Chakraborty
Treasurer
Ranadeb Sarkar
Members
Ajay K. Chakraborty
Arpita Gupta
Krish Ghosh
Meghmala Tarafdar
Sugata Bagchi
Co-opted Members
INDRASISH BASUROYCHOWDHURY
DIBYENDU BAL
ANASUYA SEN
SUDIPTA CHAKRABORTY

BOARD OF TRUSTEES
Chairman
Milan Awon
milanawon@gmail.com
Members
Abhik Dasgupta
Ashok Rakhit
Ashis Sengupta
Dilip Chakrabarti
Kallol Chattopadhyay
Kumar S. Mandal
Pranab Das
Purna Bhattacharya
Surajit Sengupta

NY Life Insurance Company Agent: Samragnee Majumdar Your trusted agent for Life And Financial Products.

Call 732-744-3908 (B) 732-692-4818 (C)
Email:smajumdar@ft.neworklife.com

FOR SALE: CHARMING FLAT

A RARE FIND: CHARMING FLAT IN A PREMIUM LOCATION IN SOUTH KOLKATA WITH STUNNING VIEWS OF THE RABINDRA SAROBAR LAKE AND MAJESTIC TREES FROM EVERY WINDOW! THIS FURNISHED FLAT IS 1250 SQ FEET (3 BR, 2 FULL BATHS); ON THE 7TH FLOOR WITH THE FRONT HANGING BALCONY FACING THE LAKES AND BOTH SIDES (S&W) FULLY OPEN (WEST FACES A PARK) WITH LOTS OF SUNLIGHT AND LOVELY CLEAN BREEZE. ALL YEAR ROUND. THIS BEAUTIFUL FLAT HAS IT ALL! IT IS A RARE FIND IN ALL OF KOLKATA. A HIDDEN GEM!

FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT:
MRS. SUDIPTA BROOKS. 704-491-1855

WITH BEST COMPLIMENTS FROM
A true well wisher of Cultural Association Of Bengal (CAB)

বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘের সভ্য হউন

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL

Tax-exempt, Non-profit Educational and Cultural Organization
Certification of Incorporation : 14309, NYS Department of Education.
IRSEmp.No.51-0180481

Membership Fee:
[ ] US$ 25.00 (USA _ Annual)
[ ] US$ 250.00 (USA – Life)
[ ] US$ 35.00 (Canada – Annual)
[ ] US$350.00(Canada – Life)

MEMBERSHIP FORM

Name: ______________________________
Spouse's Name: ______________________
Address: ____________________________
City: ______________ State: _____ ZIP ______
Phone #: ____________ E-mail: ____________

Enclosed a Check / Money order (Payable to CAB): $ ____

Signature : ______________________ Date: ________

PLEASE CHEK ONE:
NEW MEMBER: ☐
RENEWAL: ☐

MAIL TO: RANADEB SARKAR
346 YALE ROAD
GARDEN CITY, NY 11530

Please send all articles by Email: (address) sangbadbichitracab@gmail.com
Enquiries about Sangbad Bichitra ; Please contact : ARPITA GUPTA 973-919-0724

Any questions for Membership or Advertisement dues, Please Contact : Ranadeb Sarkar 346 Yale Road Garden City, NY - 11530. ranusarkar@hotmail.com

যদি আপনার নামের বানান ও ঠিকানা ভুল থাকে এবং বাড়ী পরিবর্তন করবেন শীঘই ইমেইল করুন: chittasaha@Hotmail.com

The Sangbad Bichitra, Periodical (USPS # 020-877) is published monthly by Cultural Association of Bengal from 200 Winston Drive# 2920, Cliffside Park, NJ-07010 and additional mailing offices.
POSTMASTER :
Send address changes to Sangbad Bichitra, 4 Entrance Way, Purdys NY 10578

কোন আসনে কে জয়ী

বীরভূম

সিউড়ি: বিকাশ রায়চৌধুরী (তৃণমূল), দুবরাজপুর: অনুপ সাহা (বিজেপি), বোলপুর: চন্দ্রনাথ সিং (তৃণমূল), নানুর: বিধানচন্দ্র মাঝি (তৃণমূল), লাভপুর: অভিজিৎ সিংহ (তৃণমূল), সাঁইথিয়া: নীলাবতী সাহা (তৃণমূল), ময়ূরেশ্বর: অভিজিৎ রায় (তৃণমূল), রামপুরহাট: আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় (তৃণমূল), হাঁসন: অশোক চট্টোপাধ্যায় (তৃণমূল), নলহাটি: রাজেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ (তৃণমূল), মুরারই: মোশারফ হোসেন (তৃণমূল)

পূর্ব মেদিনীপুর

তমলুক: সৌমেনকুমার মহাপাত্র (তৃণমূল), পাঁশকুড়া পূর্ব: বিপ্লব রায়চৌধুরী (তৃণমূল), পাঁশকুড়া পশ্চিম: ফিরোজা বিবি (তৃণমূল), ময়না: অশোক ডিন্ডা (বিজেপি), নন্দকুমার: সুকুমার দে (তৃণমূল), মহিষাদল: তিলক চক্রবর্তী (তৃণমূল), হলদিয়া: তাপসী মণ্ডল (বিজেপি), নন্দীগ্রাম: শুভেন্দু অধিকারী (বিজেপি), চণ্ডীপুর: সোহম চক্রবর্তী (তৃণমূল), পটাশপুর: উত্তম বারিক (তৃণমূল), কাঁথি উত্তর: সুমিতা সিংহ (বিজেপি), কাঁথি দক্ষিণ: অরূপকুমার দাস (বিজেপি), ভগবানপুর: রবীন্দ্রনাথ মাইতি (বিজেপি), খেজুরি: শান্তনু প্রামাণিক (বিজেপি), রামনগর: অখিল গিরি (তৃণমূল), এগরা: তরুণ মাইতি (তৃণমূল)

ঝাড়গ্রাম

নয়াগ্রাম: দুলাল মুর্মু (তৃণমূল), গোপীবল্লভপুর: খগেন্দ্রনাথ মাহাতো (তৃণমূল), ঝাড়গ্রাম: বীরবাহা হাঁসদা (তৃণমূল), বিনপুর: দেবনাথ হাঁসদা (তৃণমূল)

পশ্চিম মেদিনীপুর

দাঁতন: বিক্রমচন্দ্র প্রধান (তৃণমূল), কেশিয়াড়ি: পরেশ মুর্মু (তৃণমূল), খড়্গপুর সদর: হিরণ চট্টোপাধ্যায় (বিজেপি), নারায়ণগড়: সূর্যকান্ত অট্ট (তৃণমূল), সবং: মানস ভুঁইয়া (তৃণমূল), পিংলা: অজিত মাইতি (তৃণমূল), খড়্গপুর গ্রামীণ: দীনেন রায় (তৃণমূল), ডেবরা: হুমায়ুন কবীর (তৃণমূল), দাসপুর: মমতা ভুঁইয়া (তৃণমূল), ঘাটাল: শীতল কপাট (বিজেপি), চন্দ্রকোনা: অরূপ ধাড়া (তৃণমূল), গড়বেতা: উত্তরা সিংহ (তৃণমূল), শালবনি: শ্রীকান্ত মাহাতো (তৃণমূল), কেশপুর: শিউলি সাহা (তৃণমূল), মেদিনীপুর: জুন মালিয়া (তৃণমূল)

হাওড়া

উলুবেড়িয়া উত্তর: নির্মল মাজি (তৃণমূল), উলুবেড়িয়া দক্ষিণ: পুলক রায় (তৃণমূল), উলুবেড়িয়া পূর্ব: বিদেশ বসু (তৃণমূল), শ্যামপুর: কালীপদ মণ্ডল (তৃণমূল), বাগনান: অরুণাভ সেন (তৃণমূল), আমতা: সুকান্ত পাল (তৃণমূল), উদয়নারায়ণপুর: সমীর পাঁজা (তৃণমূল), জগৎবল্লভপুর: সতীনাথ ঘোষ (তৃণমূল), বালি: রাণা চট্টোপাধ্যায় (তৃণমূল), হাওড়া মধ্য: অরূপ রায় (তৃণমূল), হাওড়া উত্তর: গৌতম চৌধুরী (তৃণমূল), শিবপুর: মনাজ তিওয়ারি (তৃণমূল), হাওড়া দক্ষিণ: নন্দিতা চক্রবর্তী (তৃণমূল), সাঁকরাইল: প্রিয়া পাল (তৃণমূল), পাঁচলা: গুলশন মল্লিক (তৃণমূল), ডোমজুড়: কল্যাণ ঘোষ (তৃণমূল)

হুগলি

জাঙ্গিপাড়া: স্নেহাশিস চক্রবর্তী (তৃণমূল), হরিপাল: করবী মান্না (তৃণমূল), ধনেখালি: অসীমা পাত্র (তৃণমূল), তারকেশ্বর: রমেন্দ্র সিংহ রায় (তৃণমূল), পুরশুড়া: বিমান ঘোষ (বিজেপি), আরামবাগ: মধুসূদন বাগ (বিজেপি), গোঘাট: বিশ্বনাথ কারক (বিজেপি), খানাকুল: সুশান্ত ঘোষ (বিজেপি), উত্তরপাড়া: কাঞ্চন মল্লিক (তৃণমূল), শ্রীরামপুর: সুদীপ্ত রায় (তৃণমূল), চাঁপদানি: অরিন্দম গুঁইন (তৃণমূল), সিঙ্গুর: বেচারাম মান্না (তৃণমূল), চন্দননগর: ইন্দ্রনীল সেন (তৃণমূল), চুঁচুড়া: অসিত মজুমদার (তৃণমূল), বলাগড়: মনোরঞ্জন ব্যাপারী (তৃণমূল), পাণ্ডুয়া: রত্না দে নাগ (তৃণমূল), সপ্তগ্রাম: তপন দাশগুপ্ত (তৃণমূল), চণ্ডীতলা: স্বাতী খন্দকার (তৃণমূল)

পূর্ব বর্ধমান

খণ্ডঘোষ: নবীনচন্দ্র বাগ (তৃণমূল), বর্ধমান দক্ষিণ: খোকন দাস (তৃণমূল), বর্ধমান উত্তর: নিশীথকুমার মালিক (তৃণমূল), রায়না: শম্পা ধাড়া (তৃণমূল), জামালপুর: অলোককুমার মাঝি (তৃণমূল), মেমারি: মধুসূদন ভট্টাচার্য (তৃণমূল), জামালপুর: আলোককুমার মাঝি (তৃণমূল), মেমারি: মধুসূদন ভট্টাচার্য (তৃণমূল), কালনা: দেবপ্রসাদ বাগ (তৃণমূল), মন্তেশ্বর: সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী (তৃণমূল), ভাতার: মানগোবিন্দ অধিকারী (তৃণমূল), কাটোয়া: রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (তৃণমূল), পূর্বস্থলী উত্তর: তপন চট্টোপাধ্যায় (তৃণমূল), পূর্বস্থলী দক্ষিণ: স্বপন দেবনাথ (তৃণমূল), কেতুগ্রাম: শেখ সাহেনেওয়াজ (তৃণমূল), মঙ্গলকোট: অপূর্ব চৌধুরী (তৃণমূল), আউশগ্রাম: অভেদানন্দ থান্দার (তৃণমূল), গলসি: নেপাল ঘড়ুই (তৃণমূল)

পশ্চিম বর্ধমান

বারাবনি: বিধান উপাধ্যায় (তৃণমূল), জামুড়িয়া: হরেরাম সিংহ (তৃণমূল), পাণ্ডবেশ্বর: নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (তৃণমূল), রানিগঞ্জ: তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় (তৃণমূল), দুর্গাপুর পূর্ব: প্রদীপ মজুমদার (তৃণমূল), আসানসোল উত্তর: মলয় ঘটক (তৃণমূল), আসানসোল দক্ষিণ: অগ্নিমিত্রা পাল (বিজেপি), দুর্গাপুর পশ্চিম: লক্ষ্মণ ঘোড়ুই (বিজেপি), কুলটি: অজয় পোদ্দার (বিজেপি)

পুরুলিয়া

বান্দোয়ান: রাজীবলোচন সরেন (তৃণমূল), বলরামপুর: বাণেশ্বর মাহাতো (বিজেপি), বাঘমুণ্ডি: সুশান্ত মাহাতো (তৃণমূল), জয়পুর: নরহর মাহাতো (বিজেপি), পুরুলিয়া: সুদীপ মুখোপাধ্যায় (বিজেপি), মানবাজার: সন্ধ্যারানি টুডু (তৃণমূল), কাশীপুর: কমলাকান্ত হাঁসদা (বিজেপি), পাড়া: নদীয়ারচাঁদ বাউরি (বিজেপি), রঘুনাথপুর: বিবেকানন্দ বাউরি (বিজেপি)

বাঁকুড়া

শালতোড়া: চন্দনা বাউড়ি (বিজেপি) ছাতনা: সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (বিজেপি), রানিবাঁধ: জ্যোৎস্না মান্ডি (তৃণমূল), রাইপুর: মৃত্যুঞ্জয় মুর্মু (তৃণমূল), তালডাংরা: অরূপ চক্রবর্তী (তৃণমূল), বাঁকুড়া: নীলাদ্রিশেখর দানা (বিজেপি), বড়জোড়া: অলোক মুখোপাধ্যায় (তৃণমূল), ওন্দা: অমরনাথ শাখা (বিজেপি), বিষ্ণুপুর: তন্ময় ঘোষ (বিজেপি), কোতুলপুর: হরকালী প্রতিহার (বিজেপি), ইন্দাস: নির্মলকুমার ধাড়া (বিজেপি), সোনামুখী: দিবাকর ঘরামি (বিজেপি)

কলকাতা

কলকাতা বন্দর: ফিরহাদ হাকিম (তৃণমূল), ভবানীপুর: শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় (তৃণমূল), রাসবিহারী: দেবাশিস কুমার (তৃণমূল), বালিগঞ্জ: সুব্রত মুখোপাধ্যায় (তৃণমূল), চৌরঙ্গি: নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় (তৃণমূল), এন্টালি: স্বর্ণকমল সাহা (তৃণমূল), বেলেঘাটা: পরেশ পাল (তৃণমূল), জোড়াসাঁকো: বিবেক গুপ্ত (তৃণমূল), শ্যামপুকুর: শশী পাঁজা (তৃণমূল), মানিকতলা: সাধন পাণ্ডে (তৃণমূল), কাশীপুর-বেলগাছিয়া: অতীন ঘোষ (তৃণমূল)

কোচবিহার

কোচবিহার উত্তর: সুকুমার রায় (বিজেপি), কোচবিহার দক্ষিণ: নিখিলরঞ্জন দে (বিজেপি), নাটাবাড়ি: মিহির গোস্বামী (বিজেপি), তুফানগঞ্জ: মালতী রাভা (বিজেপি), সিতাই: জগদীশচন্দ্র বসুনিয়া (তৃণমূল), শীতলখুচি: বরেন বর্মণ (বিজেপি), মাথাভাঙা: সুশীলচন্দ্র বর্মণ (বিজেপি), দিনহাটা: নিশীথ প্রামাণিক (বিজেপি), মেখলিগঞ্জ: পরেশচন্দ্র অধিকারী (তৃণমূল)

আলিপুরদুয়ার

আলিপুরদুয়ার: সুমন কাঞ্জিলাল (বিজেপি), কুমারগ্রাম: মনোজকুমার ওরাওঁ (বিজেপি), ফালাকাটা: দীপক বর্মণ (বিজেপি), মাদারিহাট: মনোজ টিগ্গা (বিজেপি), কালচিনি: বিশাল লামা (বিজেপি)

জলপাইগুড়ি

ময়নাগুড়ি: কৌশিক রায় (বিজেপি), ধূপগুড়ি: বিষ্ণুপদ রায় (বিজেপি), জলপাইগুড়ি: প্রদীপকুমার বর্মা (তৃণমূল), মালবাজার: বুলুচিক বড়াইক (তৃণমূল), নাগরাকাটা: পুণা ভেঙ্গরা (বিজেপি), রাজগঞ্জ: খগেশ্বর রায় (তৃণমূল), ডাবগ্রাম: ফুলবাড়ি শিখা চট্টোপাধ্যায় (বিজেপি)

দার্জিলিং

দার্জিলিং: নীরজ জিম্বা (বিজেপি), কার্শিয়াং: বিষ্ণুপদ শর্মা (বিজেপি), শিলিগুড়ি: শঙ্কর ঘোষ (বিজেপি), মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি: আনন্দময় বর্মণ (বিজেপি), ফাঁসিদেওয়া: দুর্গা মুর্মু (বিজেপি)

কালিম্পং

কালিম্পং: রুদেন সাদা লেপচা (নির্দল-বিনয়পন্থী মোর্চা)

উত্তর দিনাজপুর

চোপড়া: হামিদুল রহমান (তৃণমূল), ইসলামপুর: আব্দুল করিম চৌধুরী (তৃণমূল), গোয়ালপোখর) গোলাম রব্বানি (তৃণমূল), চাকুলিয়া: মিনহাজুল আরফিন আজাদ (তৃণমূল), করণদিঘি: গৌতম পাল (তৃণমূল), হেমতাবাদ: সত্যজিৎ বর্মণ (তৃণমূল), কালিয়াগঞ্জ: সৌমেন রায় (বিজেপি), রায়গঞ্জ: কৃষ্ণ কল্যাণী (বিজেপি), ইটাহার: মোশারফ হোসেন (তৃণমূল)

দক্ষিণ দিনাজপুর

কুশমণ্ডি: রেখা রায় (তৃণমূল), কুমারগঞ্জ: তোরাফ হোসেন মণ্ডল (তৃণমূল), গঙ্গারামপুর: সত্যেন্দ্রনাথ রায় (বিজেপি), হরিরামপুর: বিপ্লব মিত্র (তৃণমূল), তপন: বুধরাই টুডু (বিজেপি), বালুরঘাট: অশোক লাহিড়ী (বিজেপি)

মালদহ

হবিবপুর: জোয়েল মুর্মু (বিজেপি), গাজল: চিন্ময় দেব বর্মণ (বিজেপি), চাঁচল: নীহাররঞ্জন ঘোষ (তৃণমূল), হরিশ্চন্দ্রপুর: তজমুল হোসেন (তৃণমূল), মালতীপুর: আব্দুর রহিম বক্সি (তৃণমূল), রতুয়া: সমর মুখোপাধ্যায় (তৃণমূল), মানিকচক: সাবিত্রী মিত্র (তৃণমূল), মালদহ: গোপালচন্দ্র সাহা (বিজেপি), ইংরেজবাজার: শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী (বিজেপি), মোথাবাড়ি: সাবিনা ইয়াসমিন (তৃণমূল), সুজাপুর: আব্দুল গনি (তৃণমূল), বৈষ্ণবনগর: চন্দনা সরকার (তৃণমূল)

মুর্শিদাবাদ

ফরাক্কা: মনিরুল ইসলাম (তৃণমূল), সুতি: ইমানি বিশ্বাস (তৃণমূল), রঘুনাথগঞ্জ: আখরুজ্জামান (তৃণমূল), সাগরদিঘি: সুব্রত সাহা (তৃণমূল), লালগোলা: মহম্মদ আলি (তৃণমূল), ভগবানগোলা: ইদ্রিশ আলি (তৃণমূল), রানিনগর: সৌমিক হোসেন (তৃণমূল), মুর্শিদাবাদ: গৌরীশঙ্কর ঘোষ (বিজেপি), নবগ্রাম: কানাইচন্দ্র মণ্ডল (তৃণমূল), খড়গ্রাম: আশিস মার্জিত (তৃণমূল), ঝড়গ্রাঁ: জীবনকৃষ্ণ সাহা (তৃণমূল), কান্দি: অপূর্ব সরকার (ডেভিড) (তৃণমূল), ভরতপুর: হুমায়ুন কবীর (তৃণমূল), রেজিনগর: রবিউল আলম চৌধুরী (তৃণমূল), বেলডাঙা: হাসানুজ্জামান শেখ (তৃণমূল), বহরমপুর: কাঞ্চন মৈত্র (বিজেপি), হরিহরপাড়া: নিয়ামত শেখ (তৃণমূল), নওদা: সাহিনা মমতাজ বেগম (খান) (তৃণমূল), ডোমকল: জাফিকুল ইসলাম (তৃণমূল), জলঙ্গি: আব্দুর রজ্জাক (তৃণমূল)

নদিয়া

করিমপুর: বিমলেন্দু সিংহ রায় (তৃণমূল), তেহট্ট: তাপসকুমার সাহা (তৃণমূল), পলাশিপাড়া: মানিক ভট্টাচার্য (তৃণমূল), কালীগঞ্জ: নাসিরুদ্দিন আহমেদ (তৃণমূল), নাকাশিপাড়া: কল্লোল খাঁ (তৃণমূল), চাপড়া: রুকবানুর রহমান (তৃণমূল), কৃষ্ণনগর উত্তর: মুকুল রায় (বিজেপি), নবদ্বীপ: পুণ্ডরীকাক্ষ সাহা (তৃণমূল), কৃষ্ণনগর দক্ষিণ: উজ্জ্বল বিশ্বাস (তৃণমূল), শান্তিপুর: জগন্নাথ সরকার (বিজেপি), রানাঘাট উত্তর পশ্চিম: পার্থসারথী চট্টোপাধ্যায় (বিজেপি), কৃষ্ণগঞ্জ: আশিসকুমার বিশ্বাস (বিজেপি), রানাঘাট দক্ষিণ: মুকুটমণি অধিকারী (বিজেপি), চাকদহ: বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ (বিজেপি), কল্যাণী: অম্বিকা রায় (বিজেপি), হরিণঘাটা: অসীম সরকার (বিজেপি)

উত্তর ২৪ পরগনা

বাগদা: বিশ্বজিৎ দাস (বিজেপি), বনগাঁ উত্তর: অশোক কীর্তনিয়া (বিজেপি), বনগাঁ দক্ষিণ: স্বপন মজুমদার (বিজেপি), বারাসাত: চিরঞ্জিত (তৃণমূল), মধ্যমগ্রাম: রথীন ঘোষ (তৃণমূল), দেগঙ্গা: রহিমা মণ্ডল (তৃণমূল), গাইঘাটা: সুব্রত ঠাকুর (বিজেপি), স্বরূপনগর: বীণা মণ্ডল (তৃণমূল), বাদুড়িয়া: কাজি আব্দুর রহিম (তৃণমূল), হাবড়া: জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক (তৃণমূল), হাড়োয়া: শেখ নুরুল ইসলাম (হাজি) (তৃণমূল), অশোকনগর: নারায়ণ গোস্বামী (তৃণমূল), আমডাঙা: রফিকুর রহমান (তৃণমূল), বীজপুর: সুবোধ অধিকারী (তৃণমূল), নৈহাটি: পার্থ ভৌমিক (তৃণমূল), ভাটপাড়া: পবন সিংহ (বিজেপি), জগদ্দল: সোমনাথ শ্যাম (তৃণমূল), নোয়াপাড়া: মঞ্জু বসু (তৃণমূল), ব্যারাকপুর: রাজ চক্রবর্তী (তৃণমূল), খড়দহ: কাজল সিংহ (তৃণমূল), দমদম উত্তর: চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য (তৃণমূল), পানিহাটি: নির্মল ঘোষ (তৃণমূল), কামারহাটি: মদন মিত্র (তৃণমূল), বরাহনগর: তাপস রায় (তৃণমূল), রাজারহাট-নিউটাউন: তাপস চট্টোপাধ্যায় (তৃণমূল), বিধাননগর: সুজিত বসু (তৃণমূল), রাজারহাট-গোপালপুর: অদিতি মুন্সি (তৃণমূল), দেগঙ্গা: রহিমা মণ্ডল (তৃণমূল), মিনাখাঁ: উষারানি মণ্ডল (তৃণমূল), সন্দেশখালি: সুকুমার মাহাতো (তৃণমূল), বসিরহাট দক্ষিণ:

এরপর ৬ পাতায় ▶

ANANDA MANDIR
Hindu Temple & Community Center

Ananda Mandir
269 Cedar Grove Lane
Somerset, NJ 08873-5212
(732) 873-9821; (732) 873-8300
info@anandamandir.org

TEMPLE & CULTURAL CENTER CONSTRUCTION MILESTONES

Building Plans Approved by City - January 2012
Construction Loan of $ 3.5 million Approved- July 2012
Construction started at Ananda Mandir Site - August 2012
New Temple Ready for Services - September 2015
Cultural Center Ready for Use - October 2016

HISTORY & MISSION

With limited funds but unlimited hope, leading members of the Bengali community in New Jersey got together in 1995 and incorporated Ananda Mandir as a non-profit, tax-exempt organization. Following intensive efforts to locate a property that could accommodate a Temple as well as a Community Center, Ananda Mandir purchased a 7.5 acre property in December, 1997. At that time, the property included a 2800 sq. ft., 6-year old ranch-style building and two additional usable structures. The purchase was made possible through a combination of member donations, a bank loan, a seller-held mortgage and loans from a few members Ananda Mandir became debt-free in 2001 and began a serious effort to obtain Township permits for a Hindu Temple on the site. We received Construction Permit in November, 2002 - and we celebrated Temple groundbreaking with Bhumi Puja on December 7, 2002 - a historic date in our calendar! Temple construction was completed in 2003. The old ranch-style building then became the residence for our priest and our office/meeting/classroom space.

In 2011 we launched The Campaign for Ananda Mandir with a goal of raising $1 million by the end of 2013. With your generous contributions, this goal is achieved. The Campaign funds were used primarily for the construction of a new and expanded temple with a classical Bengali temple facade and a multi-functional cultural center. This two-year, $5 million+ project was completed in 2015-2016. To fund these major construction and expansion efforts, we took and bank loan of $3.5 million.

in June 2018, Ananda Mandir Hosted NABC 2018 at Atlantic City, NJ. NABC 2018 was a great success and enjoyed by thousands of Bengalis from all over the USA.

Programs & Services

Educational

Wide range of classes with partner organizations in language, dance and singing. Highlight events include youth activities and the seniors forum.

Cultural

Regular activities in multiple areas including musical, literary, and discussions sessions. Key events include monthly Ananda Sandhya and Sahitya-o-Alochona.

YOUTH ACTIVITIES

Ananda Mandir has an active Youth group which organizes a variety of activities throughout the year. These include the Summer Picnic, Kishalay Newsletter, and the recently introduced Kishalay Award for Writing Excellence.

KISHALAY AWARD FOR WRITING EXCELLENCE

The Kishalay Awards for Writing Excellence were established by Ananda Mandir in 2016. The award is intended to inspire the young school age children and kin of the members of Ananda Mandir to enhance their writing skills and promote community involvement. It will be administered by the Awards Recognition Committee of Ananda Mandir.

SENIOR FORUM

Primary objective is for seniors to enjoy company of other seniors and participate in a wide range of informative discussions on topics such as retirement, health and recreation. The forum organizes social gatherings such as group lunches, field trips and volunteer activities. Retirees and new-retirees are welcome to participate actively in forum meetings and activities. We usually meet once a month, usually around 1:00 pm.

SAHITYA-O-ALOCHONA

Sahitya O Alochana is a monthly literary and topical discussion forum under the aegis of Ananda Mandir that endeavors to achieve its motto “Alochana Brings Good Things to Mind.” It organizes several exciting sessions through the year, typically once a month. The scope and the reach of the discussions at the forum are ever widening and deepening. Over the last several years, these sessions have covered some very exciting and illuminating discussions on a wide variety of topics including literature, theater and movie, history, philosophy and religion, science and mathematics, economics, social issues, and finally sports.

গণনাকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার পেতে করোনা পরীক্ষার ধুম সব রাজনৈতিক শিবিরেই

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের মধ্যেই রাজ্যে বিধানসভা ভোটের গণনা আগামী রবিবার। তবে অতিমারির আবহে অতিরিক্ত সতর্কতা নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। কমিশনের নির্দেশ, গণনাকেন্দ্রে ঢুকতে গেলে অবশ্যই হাতে থাকতে হবে ২টি কোভিড টিকা নেওয়ার শংসাপত্র অথবা সরকারি ভাবে স্বীকৃত স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে র্যা পিড অ্যান্টিজেন টেস্ট-এর নেগেটিভ রিপোর্ট। অন্যথায় কাউকেই গণনাকেন্দ্রের ভিতর ঢুকতে দেওয়া হবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এর পরেই কলকাতার পাশাপাশি জেলায় জেলায় শুরু হয়েছে জোরদার তৎপরতা। জেলার নির্বাচন আধিকারিক অর্থাৎ জেলাশাসকের দফতর থেকে প্রতিটি রাজনৈতিক দল-সহ নির্বাচনের কাজে যুক্ত ব্যক্তি এবং সংবাদমাধ্যমের কর্মীদেরও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে শনিবারের মধ্যে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে গিয়ে র্যা পিড অ্যান্টিজেন টেস্ট-এর রিপোর্ট নেওয়ার জন্য। গণনাকেন্দ্রের পাশ থাকলে সেই ব্যক্তিকে র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট রিপোর্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে 'বিশেষ প্রাধান্য' দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে সরকারি নির্দেশিকায়।

এর পাশাপাশি, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক তাঁর একটি নির্দেশিকায় জানিয়েছে প্রত্যেকটি রিপোর্টের কপি সই-সহ রাজনৈতিক দলের কর্মী, প্রার্থী ও গণনাকেন্দ্রের কাজে যুক্তদের দিতে হবে। বিস্তারিত টেস্ট রিপোর্ট জেলা স্বাস্থ্য দফতরেও পাঠাতে হবে। এর মধ্যে কারও রিপোর্ট পজিটিভ এলে, তা বিশেষ ভাবে নজর দিতে হবে। ওই নির্দেশিকা জানাচ্ছে, গণনার দিনও পূর্ব মেদিনীপুরের ৫টি গণনাকেন্দ্রের পাশে একটি করে ক্যাম্প খুলে রাখা হবে র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট-এর জন্য। সকাল ৬.৩০টা থেকে এই ক্যাম্প চালু থাকবে বলে জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক নির্দেশ দিয়েছেন।

শুক্রবার সকাল থেকেই জেলার প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভিড় জমাচ্ছেন গণনাকেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত কর্মী এবং রাজনৈতিক শিবিরের প্রতিনিধিরা। স্বাস্থ্যকর্মীরাও দ্রুততার সঙ্গে র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট শুরু করে দিয়েছেন। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, এই মুহূর্তে টিকার অপ্রতুলতার জন্য নতুন করে কোনও ব্যক্তিকে প্রথম কোভিড টিকা দেওয়া হচ্ছে না। এখন কেবলমাত্র দ্বিতীয় টিকাই দেওয়া হচ্ছে। তারই মাঝে ১ মে থেকে ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে প্রত্যেককেই টিকা দেওয়া হবে ঘোষণা হলেও এখনও পর্যন্ত পর্যাপ্ত টিকার জোগান নেই বলেই সরকারি সূত্রে খবর।

ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজে চলতি সপ্তাহেই চালু হবে অক্সিজেন উৎপাদন কেন্দ্র

ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালের নয়া অক্সিজেন উৎপাদন কেন্দ্র

করোনা পরিস্থিতিতে হাসপাতাল-গুলিতে রোগীর সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকায় দেখা দিয়েছে ভয়াবহ অক্সিজেন ঘাটতি। আর তা মেটাতে রাজ্যের একাধিক হাসপাতালে নিজস্ব অক্সিজেন উৎপাদন কেন্দ্র সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। এ বার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তৈরি হচ্ছে 'প্রেশার সুইং অ্যাডসর্পশন' (পিএসএ) মেডিক্যাল অক্সিজেন প্ল্যান্ট। কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় হাসপাতালের পুরনো ভবনের কাছে জোরকদমে চলছে প্ল্যান্ট তৈরির কাজ। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী দু'-এক দিনের মধ্যে এই অক্সিজেন উৎপাদন কেন্দ্র চালু হয়ে যাবে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার স্বাস্থ্য জেলার একমাত্র কোভিড চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। ফলে স্বাস্থ্য জেলার অধীন ডায়মন্ড হারবার এবং কাকদ্বীপ মহকুমার করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসার একমাত্র ভরসা এই মেডিক্যাল কলেজ। কিন্তু দিনদিন রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকলেও বাড়েনি অক্সিজেনের যোগান। কোভিড হাসপাতাল এবং সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল মিলিয়ে ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজে মোট কোভিড শয্যার সংখ্যা ১৬০। অধিকাংশ শয্যাতেই এখন রোগী রয়েছেন এখন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন প্রায় সব করোনা আক্রান্তেরই শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা রয়েছে। কিন্তু অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দেওয়ায় উদ্বেগে আছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তাঁরা জানাচ্ছেন, অক্সিজেন প্ল্যান্ট চালু হলে এই সমস্যার সমাধান হবে।

ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশে দিনে ৩ বার করে অক্সিজেন সিলিন্ডার পৌঁছে দেওয়া হয় হাসপাতালে। ১৬০টি বি-সিলিন্ডার এবং ৮০টি ডি-সিলিন্ডার বোঝাই অক্সিজেনের জোগান থাকলেও রোগী আধিক্যের জেরে তা দ্রুতক ফুরিয়ে যায়। কিন্তু কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে হাসপাতালের পুরোনো ভবনের কাছে তৈরি হওয়া "পিএসএ" মেডিকেল অক্সিজেন প্ল্যান্ট চালু হলে প্রতিদিন গড়ে ১০০ থেকে ১২০টি ডি-সিলিন্ডারে সমপরিমাণ অক্সিজেন পাওয়া যাবে। যা থেকে ঘাটতি অনেকটাই মিটবে বলে মত কর্তৃপক্ষের।

প্ল্যান্ট থেকে পাইপ লাইন এনে জুড়ে দেওয়া হবে হাসপাতালের ম্যানিফোল্ড রুমে। আর সেখান থেকে গোটা হাসপাতালেই অক্সিজেন সরবরাহ করা হবে। এখন জোর কদমে প্ল্যান্টের পাইপ লাইন এবং বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ চলছে। এ বিষয়ে ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজের উপাধ্যক্ষ রমাপ্রসাদ রায় বলেন, "কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে এই পিএসএ) মেডিকেল অক্সিজেন প্ল্যান্ট তৈরি হচ্ছে। এখন শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে। কাজ শেষ হলে একবার পরীক্ষার পরই উৎপাদিত অক্সিজেন সরবরাহ করা হবে।"

অন্যদিকে, তরল অক্সিজেন ট্যাঙ্কার বসানোর জন্য মেডিক্যাল কলেজের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই আবেদন জানানো হয়েছে। গত শনিবার স্বাস্থ্য দফতরে চিঠি দিয়ে এই আবেদন জানান ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ। অনুমোদন মিললে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের মধ্যেই তরল অক্সিজেন ট্যাঙ্কার বসানোর কাজ শুরু হবে।

কেন্দ্র ও রাজ্যের টিকার দামে বৈষম্য কেন, মোদী সরকারকে প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের

দেশকে করোনামুক্ত করার সঙ্কল্প নিয়েছে সরকার। সে ক্ষেত্রে কেন্দ্র এবং রাজ্যের ক্ষেত্রে টিকার দাম আলাদা কেন? কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকারের উদ্দেশে ফের প্রশ্ন তুলল সুপ্রিম কোর্ট। শুধু তাই নয়, কোন রাজ্য আগে টিকা পাবে, আর কোন রাজ্য পরে, তা কিসের ভিত্তিতে ঠিক করছে সরকার, তারও জবাব চেয়েছে আদালত।

অতিমারি পরিস্থিতিতে চূড়ান্ত অব্যবস্থা নিয়ে আগেই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা দায়ের করেছিল শীর্ষ আদালত। শুক্রবার তার শুনানি চলাকালীন টিকার দাম নিয়ে কেন্দ্রকে তীব্র ভর্ৎসনা করে বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ। টিকার দাম থেকে বণ্টন, কেনার প্রক্রিয়া সব কিছুতেই বৈষম্য রয়েছে কেন, প্রশ্ন তোলে আদালত।

মূল্যবিভেদ নিয়ে কেন্দ্রের উদ্দেশে আদালত বলে, "আপনাদের কাছ থেকে ১৫০ টাকা নিলেও রাজ্যগুলির কাছ থেকে ৩০০-৪০০ টাকা নিচ্ছে টিকা প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি। দেশের নাগরিক হিসেবে এই বৈষম্য মানব কেন আমরা? এ ক্ষেত্রে খরচের ব্যবধান তো প্রায় ৩০-৪০ হাজার কোটি টাকা! টাকা দিয়েই যখন কিনব, তখন এই বিভেদ কেন? আমরা কোনও নির্দেশ দিচ্ছি না, কিন্তু আপনাদের বিষয়টি ভেবে দেখা উচিত।" আমেরিকায় অ্যাস্ট্রাজেনেকা এর চেয়েও কম দামে টিকা বিক্রি করছে বলেও মন্তব্য করে আদালত।

১মে থেকে দেশে ১৮ উর্ধ্বদের

টিকাকরণ শুরু হচ্ছে। কিন্তু কেন্দ্রের চেয়ে বেশি দামে টিকা কেনার সামর্থ নেই বলে ইতিমধ্যেই জানিয়েছে একাধিক রাজ্য। তার জেরে সম্প্রতি রাজ্যগুলির জন্য প্রতি প্রতিষেধকের দাম ৪০০ থেকে কমিয়ে ৩০০ টাকা করার সিদ্ধান্ত নেন সিরাম ইনস্টিটিউটের সিইও আদর পুণাওয়ালা। ভারত বায়োটেক রাজ্যগুলির জন্য দাম ৬০০ থেকে কমিয়ে ৪০০ করেছে। বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে ৬০০ টাকায় কোভিশিল্ড কিনতে হবে। কোভ্যাক্সিন কিনতে হবে ১২০০ টাকায়।

প্রস্তুতকার সংস্থার কাছ থেকে ৫০ শতাংশ কিনে রাজ্যগুলিকে বিনামূল্যে দেওয়া হবে বলে ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। বাকি ৫০ শতাংশ রাজ্যগুলিকে নিজের কোষাগার থেকেই খরচ করতে হবে। তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বিচারপতিরা। আদালতের যুক্তি, "কেন্দ্র নিজে কেন ১০০ শতাংশ টিকা কিনছে না? কারণ সমান ভাবে টিকা বণ্টন সেখান থেকেই সবচেয়ে ভাল ভাবে হতে পারে। যে ৫০ শতাংশ কেন্দ্র দেবে বলছে, সেটা কখন দেওয়া হবে, কাকে আগে দেওয়া হবে, তা নিয়ে কোনও ঘোষণা নেই কেন? কেন্দ্র বা রাজ্য যে-ই টিকা কিনুক না কেন, তা সাধারণ মানুষের জন্য কেনা হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা দাম কেন?"

১৮ উর্ধ থেকে ৪৫ বছর বয়সিদের সার্বিক টিকাকরণের কথা ঘোষণা করলেও দেশে ওই বয়সি মানুষের সংখ্যা ঠিক কত, সে নিয়ে কোনও তথ্য নেই কেন, অনলনাইনে টিকাকরণের যে নিয়ম বেঁধে দিয়েছে কেন্দ্র, তাতে নিরক্ষর মানুষরা কী ভাবে নাম নথিভুক্ত করবেন, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলে আদালত।

কোন আসনে কে জয়ী

▶ ৪ পাতার পর

উত্তর: রফিকুল ইসলাম মণ্ডল (তৃণমূল), হিঙ্গলগঞ্জ: দেবেশ মণ্ডল (তৃণমূল)

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

গোসাবা: জয়ন্ত নস্কর (তৃণমূল), ডায়মন্ড হারবার: পান্নালাল হালদার (তৃণমূল), ফলতা: শঙ্করকুমার নস্কর (তৃণমূল), মগরাহাট পশ্চিম: গিয়াসউদ্দিন মোল্লা (তৃণমূল), মগরাহাট পূর্ব ঃ নমিতা সাহা (তৃণমূল), কুলপি: যোগরঞ্জন হালদার (তৃণমূল), মন্দিরবাজার: জয়দেব হালদার (তৃণমূল), রায়দিঘি: অলোক জলদাতা (তৃণমূল), কাকদ্বীপ: মন্টুরাম পাখিরা (তৃণমূল), পাথরপ্রতিমা: সমীর জানা (তৃণমূল), সাগর: বঙ্কিম হাজরা (তৃণমূল), ক্যানিং পশ্চিম: পরেশরাম দাস (তৃণমূল), বাসন্তী: শ্যামল মণ্ডল (তৃণমূল), ভাঙড়: নওশাদ সিদ্দিকী, আইএসএফ, ক্যানিং পূর্ব: প্রার্থী (শওকত মোল্লা (তৃণমূল), জয়নগর: বিশ্বনাথ দাস (তৃণমূল), কুলতুলি: গণেশচন্দ্র মণ্ডল (তৃণমূল), বারুইপুর পূর্ব: বিভাস সর্দার (তৃণমূল), বারুইপুর পশ্চিম: বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় (তৃণমূল), সাতগাছিয়া: মোহনচন্দ্র নস্কর (তৃণমূল), বিষ্ণুপুর: দিলীপ মণ্ডল (তৃণমূল), সোনারপুর দক্ষিণ: লাবলি মৈত্র (তৃণমূল), সোনারপুর উত্তর: ফিরদৌসি বেগম (তৃণমূল), ভাঙড়: নৌসাদ সিদ্দিকী (তৃণমূল), কসবা: জাভেদ আহমেদ খান (তৃণমূল), যাদবপুর: দেবব্রত মজুমদার (তৃণমূল), টালিগঞ্জ: অরূপ বিশ্বাস (তৃণমূল), বেহালা পূর্ব: রত্না চট্টোপাধ্যায় (তৃণমূল), বেহালা পশ্চিম: পার্থ চট্টোপাধ্যায় (তৃণমূল), মহেশতলা: দুলালচন্দ্র দাস (তৃণমূল), বজবজ: অশোক দেব (তৃণমূল), মেটিয়াবুরুজ: আব্দুল খালেক মোল্লা (তৃণমূল)

প্রৌঢ়কে ভর্তি করাল পিপিই পরা পুলিশ

বছর ৫৮-র প্রৌঢ় পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্বাসকষ্টে বিছানায় কাতরাচ্ছেন। করোনা পরীক্ষা হয়নি শুনে বাড়িতে যেতে পারেননি পড়শিরা। স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধিকাংশ স্বাস্থ্যকর্মী করোনা আক্রান্ত হওয়ায় বাকি যাঁরা সুস্থ আছেন, তাঁরাও দ্রুত পৌঁছতে পারেননি। শেষমেশ, পড়শিদের ফোন পেয়ে রূপনারায়ণপুর ফাঁড়ির পুলিশকর্মীরা এসে ওই প্রৌঢ়কে হাসপাতালে ভর্তি করান। বৃহস্পতিবার রূপনারায়ণপুরের রূপনগরের ঘটনা।

পেশায় একটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার অস্থায়ী কর্মী পূর্ণচন্দ্রবাবু স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে থাকেন। স্ত্রী গৌরীদেবী জানান, তাঁর স্বামী গত কয়েকদিন ধরে শ্বাসকষ্টের সমস্যায় ভুগছিলেন। শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাঁরা চিকিৎসকের পরামর্শ না নিয়ে টোটকা ওষুধ দিয়েছিলেন। তাতে কাজ হয়নি। এই পরিস্থিতিতে ওই দিন সকাল থেকে প্রৌঢ়ের শ্বাসকষ্ট তীব্র হতে শুরু করে। গৌরীদেবী জানান, দিনভর কোনও ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ পড়শিরা সালানপুরের পিঠাইকেয়ারি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ফোন করে অবস্থার কথা জানান।

গৌরীদেবীর অভিযোগ, প্রায় এক ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পরেও স্বাস্থ্যকর্মীদের দেখা মেলেনি। দ্রুত পূর্ণচন্দ্রবাবুর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় সন্ধ্যা ৮টা নাগাদ ফের কয়েকজন পড়শিই রূপনারায়ণপুর ফাঁড়িতে ফোন করেন। ফাঁড়ির আইসি প্রসেনজিৎ রায় জানান, তাঁরা পিঠাইকেয়ারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে পিপিই কিট আনিয়ে, সেগুলি পরে অ্যাম্বুল্যান্স জোগাড় করে পূর্ণচন্দ্রবাবুর বাড়িতে যান। তাঁকে রাত ৯টা নাগাদ আসানসোল জেলা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। শুক্রবার আসানসোল জেলা হাসপাতালের সুপার নিখিলচন্দ্র দাস বলেন, "ওই ব্যক্তির করোনা পরীক্ষা করানো হয়েছে। পরীক্ষার ফল এখনও আসেনি। তাঁকে অক্সিজেন সাপোর্ট দেওয়া হচ্ছে। তাঁর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়।"

পুলিশের এই ভূমিকায় খুশি গৌরীদেবী। তাঁর কথায়, "খুবই অসহায় লাগছিল। কিন্তু সমস্যার সমাধান করলেন পুলিশকর্মীরা। আমরা পুলিশের প্রতি কৃতজ্ঞ। পড়শিরাও পাশে দাঁড়িয়েছেন।" আসানসোল-দুর্গাপুরের পুলিশ কমিশনার মিতেশ জৈন বলেন, "এটা খুবই ভাল উদ্যোগ। খবর পেলে এ ভাবেই পুলিশ সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে।" স্থানীয় বাসিন্দা সুজিত মাজি, আশুতোষ সুরদের প্রতিক্রিয়া, "পুলিশ খুব ভাল ভূমিকা নিয়েছে। পড়শিরাও ফোনেই যতটা পাশে দাঁড়াতে পেরেছেন, করেছেন।

কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যে কেন স্বাস্থ্যকর্মীরা পৌঁছতে পারলেন না কেন? বিএমওএইচ (সালানপুর) সুব্রত সীট বলেন, "স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী মিলিয়ে প্রায় ১৭ জন করোনা আক্রান্ত। তাই স্বাস্থ্যকর্মী জোগাড় করে ওই ব্যক্তির বাড়ি যেতে একটু সমস্যা হয়েছে। তবে পুলিশকর্মীরা যাচ্ছেন শুনে আমরা হাসপাতাল থেকে পিপিই কিট পাঠিয়েছি।" ব্লক স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হচ্ছে। রিপোর্ট পাওয়ার পরে, তেমন হলে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে। পাশাপাশি, চিকিৎসকদের আর্জি, শ্বাসকষ্টের মতো কোনও রকম উপসর্গ দেখা গেলেই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

রিপোর্ট না-থাক, উপসর্গ থাকলে ফেরানো বারণ

ঘটনা-১: আচমকাই প্রবল শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছিল বৃদ্ধের। শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা নেমে গিয়েছিল ৮৫ শতাংশে। পরিচিত চিকিৎসকের পরামর্শে স্বজনেরা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু ভর্তি করানো যায়নি! কারণ ওই বৃদ্ধের কোভিড পরীক্ষা করা হয়নি। তাই রিপোর্ট ছিল না।

ঘটনা-২: কয়েক দিন ধরেই জ্বর ছিল এক প্রৌঢ়ার। সঙ্গে শ্বাসকষ্ট। চিকিৎসকের পরামর্শে কোভিড পরীক্ষা করানো হয়। কিন্তু তিন দিন পরেও রিপোর্ট আসেনি। বাড়িতেও আর অক্সিজেন দিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। অগত্যা আত্মীয়েরা প্রৌঢ়াকে নিয়ে ছুটলেন হাসপাতালে। কিন্তু কোভিড হাসপাতালের কর্মীরা সাফ জানালেন, করোনা রিপোর্ট না-থাকায় তাঁরা ভর্তি করতে পারবেন না। অ্যাম্বুল্যান্সে অক্সিজেন শেষ হয়ে আসছে দেখে প্রৌঢ়ার স্বজনেরা বার বার অনুরোধ করায় ওই কর্মীরা রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের 'অ্যাডমিশন সেল'-এ জানানোর পরামর্শ দিলেন। সেখান থেকে বললে বা হাসপাতালের শীর্ষ কর্তাদের অনুমতি মিললে তবেই প্রৌঢ়াকে ভর্তি নেওয়া সম্ভব।

করোনা আগ্রাসনের আবহে রোজই এমন অসংখ্য ঘটনার সাক্ষী থাকছে শহর ও জেলা। প্রবল উপসর্গ সত্ত্বেও শুধু কোভিড রিপোর্ট না-থাকায় হাসপাতালে ভর্তি হওয়া যাচ্ছে না এবং ভর্তি হতে না-পেরে প্রাণহানিও ঘটছে। পরে আসা রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, রোগী কোভিড পজিটিভ ছিলেন। এমন ঘটনা যাতে আর না-ঘটে, সেই জন্য কড়া সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। স্বাস্থ্য দফতর নতুন বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, রিপোর্ট না-থাকলেও করোনার উপসর্গযুক্ত, বিশেষ করে শ্বাসকষ্টের রোগীকে হাসপাতাল থেকে ফেরানো যাবে না। প্রয়োজন হলে 'সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ইলনেস' বা "সারি"-শয্যায় ভর্তি নিয়ে রোগীর চিকিৎসা দ্রুত শুরু করে দিতে হবে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, সঙ্কটজনক রোগীকে স্থিতিশীল না-করে এবং শয্যার ব্যবস্থা না-করে 'রেফার' বা অন্য কোথাও পাঠানো যাবে না।

স্বাস্থ্য অধিকর্তা অজয় চক্রবর্তী এবং স্বাস্থ্য-শিক্ষা অধিকর্তা দেবাশিস ভট্টাচার্যের সই করা ওই বিজ্ঞপ্তি জানাচ্ছে স্বাস্থ্য দফতরের পর্যবেক্ষণ, বহু সম্ভাব্য করোনা রোগীই পরীক্ষার রিপোর্ট পাচ্ছেন অনেক দেরিতে। অথচ তাঁদের অনেকেরই অবস্থা এমন যে, জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসা শুরু করা দরকার। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হাসপাতালে ভর্তি হতে গিয়ে চরম ভোগান্তি হচ্ছে ওই সব রোগীর। দীর্ঘ দিন ধরেই সঙ্কটজনক রোগীর স্বজনদের একাংশ অভিযোগ করে আসছেন যে, জরুরি পরিস্থিতিতেও হাসপাতালে ভর্তি করাতে গেলে স্বাস্থ্য দফতরের অ্যাডমিশন সেলের মাধ্যমে আসতে বলা হচ্ছে। কিন্তু অনেক সময়েই সংশ্লিষ্ট হেল্পলাইনে যোগাযোগ করা সত্ত্বেও ভর্তির ব্যবস্থা করতে দীর্ঘ সময় লেগে যাচ্ছে। "রোগী অক্সিজেনের জন্য ছটফট করছে। অথচ কখন অ্যাডমিশন সেলের নম্বরে লাইন মিলবে, তার জন্য ফোনে অপেক্ষা করতে হবে অনন্ত কাল! এটা কি কারও পক্ষে সম্ভব" প্রশ্ন এক রোগীর আত্মীয়ের।

এই অবস্থায় জরুরি চিকিৎসা দ্রুত শুরু করার উপরে জোর দিচ্ছে স্বাস্থ্য ভবন। এক স্বাস্থ্য আধিকারিক বললেন, "আচমকা কোনও রোগী সঙ্কটজনক হয়ে পড়লেন। কোভিড রিপোর্ট নেই বলে বা স্বজনেরা হেল্পলাইনে যোগাযোগ করতে পারেননি বলে তাঁর চিকিৎসা হবে না এটা তো হতে পারে না।"

নতুন বিজ্ঞপ্তিতে সব কোভিড হাসপাতালকে জানানো হয়েছে, রিপোর্ট নেই, অথচ শ্বাসকষ্ট হচ্ছে বা অন্য উপসর্গ দেখে কোভিড রোগী বলে সন্দেহ হলে তাঁকে অবিলম্বে "সারি" ওয়ার্ডে ভর্তি করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা চালু করতে হবে। সেই সময়েই সংশ্লিষ্ট রোগীর র‌্যাপিড অ্যান্টিজেন পরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে, তিনি কোভিড পজিটিভ কি না। স্বাস্থ্য সূত্রের খবর, রিপোর্ট পজিটিভ এলে রোগীকে কোভিড ওয়ার্ডে পাঠাতে হবে। নেগেটিভ এলে আরটিপিসিআর পরীক্ষার রিপোর্ট আসার আগে পর্যন্ত সারি ওয়ার্ডেই তাঁর চিকিৎসা চলবে। যদি সেই পরীক্ষার রিপোর্টও নেগেটিভ আসে, তা হলে প্রয়োজনীয় আরও কয়েকটি পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে রোগীকে সাধারণ ওয়ার্ডে পাঠানো যেতে পারে।

বাজ পড়ে শালবনিতে প্রাণ গেল দু'জনের, ঝড়ে লন্ডভন্ড পুরুলিয়া

ঘণ্টাখানেকের বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি, সঙ্গে প্রবল ঝড়। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সেই ঝড়বৃষ্টির সময়ে পশ্চিম মেদিনীপুরে মৃত্যু হল দু'জনের। গুরুতর জখম ১ জন। পুরুলিয়ার বিস্তীর্ণ অংশেও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে প্রাণহানির কোনও ঘটনা ঘটেনি।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শালবনি থানা এলাকার লালগেরিয়া থেকে কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন ৪ জন। রাস্তাতেই বজ্রপাতে দু'জনের মৃত্যু হয়। ওই দু'জন সম্পর্কে শ্বশুর-জামাই। ৪ জনই বাড়ি ফিরছিলেন সাইকেলে করে। মেঠো রাস্তা ধরে যাওয়ার সময় বাজ পড়ে। ঘটনাস্থলেই দু'জনের মৃত্যু হয়। আহত হয়েছে অন্য এক জন। পুলিশ এখনও তিন জনের পরিচয় জানতে পারেনি। তাঁদের বাড়ির খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ। আহত ব্যক্তিকে শালবনি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মৃতদেহ দু'টি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। শুক্রবার ময়নাতদন্ত হবে বলে জানা গিয়েছে।

অন্য দিকে ঘণ্টাখানেকের কালবৈশাখীতে লন্ডভন্ড পুরুলিয়ার বান্দোয়ান ও মানবাজার ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম। বৃহস্পতিবার বিকেলে কালো মেঘের সঙ্গে কালবৈশাখী ঝড় ওঠে। সঙ্গে শিলাবৃষ্টি। বিভিন্ন এলাকা ঝড়ে লন্ডভন্ড হয়ে যায়। কোথাও বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে পড়ে। কোথাও আবার উপড়ে গিয়েছে গাছ। অনেক জায়গায় দোকান-বাড়ির ছাউনি উড়ে গিয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর।

মধুপুর থেকে জিপিডি যাওয়ার রাস্তার উপরেই ভেঙে পড়ে বিদ্যুতের খুঁটি। এর ফলে ওই রাস্তায় যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায় বেশ কিছু ক্ষণ। বাহাদুরপুর গ্রামে বিদ্যুতের তারের উপরেই ভেঙে পড়ে গাছ। মানবাজার ২ নম্বর ব্লকে এই ঝড়ের তাণ্ডবে বেশ কিছু দোকানের চালা উড়ে গিয়েছে। বান্দোয়ানের তালপাত গ্রামের মোড়ে বেশ কিছু ঘরের অ্যাসবেস্টসের ছাউনি ভেঙে পড়ে। রাত পর্যন্ত মানবাজার ও বান্দোয়ানের বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মেরামতির কাজ শুরু করেছেন বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মীরা। প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, ঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলেও তার পরিমাণ এখনও স্পষ্ট নয়। ঝড় ছাড়াও শিলাবৃষ্টির ফলে জেলায় বহু সব্জি চাষি ক্ষতির সম্মুখীন হবেন বলে প্রশাসনের আশঙ্কা।

পুরুলিয়ার গ্রামে শিব হিসেবেই পুজো পান পার্শ্বনাথ, ঋষভনাথরা

শুভাশিস চক্রবর্তী

সন্তানহীনা রমণীরা মানত করেন 'ন্যাংটা ঠাকুর'-এর কাছে। সন্তান জন্মের পর ঘটা করে পুজোও দেন মানসপূরণের সন্তুষ্টিতে। দরিদ্র, হয়তো বা নিরক্ষর মা জানেনও না, যে দেবতার বরে তিনি মাতৃত্বের স্বাদ পেলেন, সেই মূর্তি কোনও হিন্দু দেবতার নয়, ওটি আসলে দিগম্বর জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি। বাঁকুড়া জেলার দ্বারকেশ্বর নদের গতিপথে দেখতে পাওয়া যায় সোনাতোপল, বহুলাড়া, ধরাপাটের বিখ্যাত জৈন মন্দিরগুলি। এই ধরাপাটের মন্দিরেই 'ন্যাংটা ঠাকুর'-এর অবস্থান। আবার জৈন তীর্থঙ্কর পার্শনাথের মূর্তিতে সর্পলাঞ্ছনচিহ্ন আছে বলে, পুরুষসঙ্কেত থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় মানুষের কাছে তিনি মনসারূপে পূজা পান! সনাতন হিন্দুধর্মে যে এখনও সমন্বয়ী ধর্মচেতনাই মূল শক্তি, তার প্রমাণ বহুলাড়ার জৈন মন্দিরে পরবর্তী কালে শিব-দুর্গা-গণেশের অধিষ্ঠান হলেও জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি নিত্যপুজো থেকে বঞ্চিত হননি। হিন্দু পুরোহিত তাঁকে আজও সমান মর্যাদায় অর্চনা করেন।

বাঁকুড়ার শালতোড়া গ্রামের কাছে দামোদর নদের কাছে বিহারীনাথ পাহাড়। এটি এক সময় জৈন সংস্কৃতির উজ্জ্বল কেন্দ্র ছিল। এখানে নানা স্থানে নাগছত্রচিহ্নিত পার্শনাথের প্রস্তরমূর্তি দেখা যেত এই সে দিনও। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে আর মানুষের উদাসীনতায় কিছু নষ্ট হয়েছে, কিছু বা চোরাকারবারির বদান্যতায় বিদেশ পাড়ি দিয়েছে। এই জেলার শিলাবতী নদীর কাছে হাড়মাসরা গ্রামের মন্দিরেও আছে জৈন তীর্থঙ্করদের নিদর্শন। আবার যেখানে কুমারী নদী মিশেছে কংসাবতীর সঙ্গে, তার একটু দূরেই আছে পরেশনাথ নামের এক প্রাচীন গ্রাম। জৈন তীর্থঙ্কর পার্শনাথের নাম থেকেই এই গ্রামের নাম, এখানে ছ'ফুট উচ্চতার পার্শনাথের প্রস্তরমূর্তি পাওয়া গিয়েছিল বহু দিন আগে।

পুরুলিয়ার দেউলি গ্রামের এক প্রান্তে প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নস্তূপের গর্ভগৃহে অপূর্বদর্শন এক জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি স্থানীয় মানুষের কাছে 'ইড়গুনাথ' নামে পরিচিতি পেয়েছে। আশপাশে আছে অন্য জৈন তীর্থঙ্করদের ছোট ছোট মূর্তি। কর্নেল ডালটন ১৮৬৪-৬৫ সালে কাঁসাই নদীর তীরবর্তী মানভূম-পুরুলিয়ার পুরাকীর্তি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। সেই বিস্ময়ের রেশ থেকে প্রবন্ধ লিখেছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে। এর আট বছর পর, ১৮৭২ সাল নাগাদ আর্কিয়োলজিক্যাল সার্ভে বিভাগে পদাসীন জে ডি বেগলার এই এলাকার দুর্গম অঞ্চলগুলিতে হাতির পিঠে চড়ে জৈন মন্দির-স্থাপত্য ও অন্যান্য পুরাকীর্তি দেখে সরকার বাহাদুরকে উচ্চ প্রশংসিত প্রতিবেদন পাঠান।

পাকবিড়রাকে এক কথায় 'পুরুলিয়ার জাদুঘর' বললে অত্যুক্তি হবে না। জেলায় যত জৈন তীর্থকেন্দ্র আছে, এটি সর্ববৃহৎ। একই স্থানে এত অজস্র মূর্তি পুরুলিয়ার অন্যত্র দেখা যায় না। বেগলার সাহেব মানভূম পরিদর্শনকালে এখানে একুশটি দেউল দেখেছিলেন, যার মধ্যে উনিশটি ছিল পাথরের। খুব সম্ভবত এখানে চব্বিশ জৈন তীর্থঙ্করের চব্বিশটি দেউল ছিল। কুপল্যান্ড সাহেবের গেজেটিয়ারেও পাকবিড়রার উল্লেখ আছে। 'পাক' শব্দের অর্থ পাখি, আর 'বিড়রা' শব্দার্থ বাসা অর্থাৎ 'পাখির বাসা'। অরণ্যবেষ্টিত এই নির্জন স্থানটিতে জৈন স্থাপত্যশিল্পীরা গড়ে তুলেছিলেন সুবিশাল এক শিল্পক্ষেত্র। একটি বৃহৎ কালো প্রস্তরখণ্ডে জৈন তীর্থঙ্কর শীতলনাথের মূর্তি পাকবিড়রার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। পদ্মফুলের ওপর কায়োৎসর্গ মুদ্রায় দণ্ডায়মান মূর্তিটিকে কুপল্যান্ড সাহেব মহাবীর তীর্থঙ্করের বলে উল্লেখ করেছেন। গ্রামের মানুষের কাছে ইনি 'শিব' হয়ে উঠেছেন, এখানকার রায় পরিবারের সদস্যেরা নিয়মিত ফুল, বেলপাতা, সিঁদুর ও চন্দন দিয়ে মূর্তিটিকে শিবজ্ঞানে পূজা করে থাকেন। এ ছাড়াও আছে মহাবীর, শাসনদেবী অম্বিকা, পার্শনাথ, চন্দ্রপ্রভ, আদিনাথ, ঋষভনাথ, এবং শিশু কোলে নারী ও পুরুষমূর্তি। কল্পবৃক্ষের নীচে একই আঙ্গিকের মূর্তিগুলিতে উপবিষ্ট প্রত্যেকের কোলে একটি করে ছোট ছোট শিশু মাতৃত্ব ও পিতৃত্বের আবেদন ফুটে উঠেছে যেন। পাকবিড়রা পুরাক্ষেত্রের অন্যতম নিদর্শন চারটি চৈত্য। আড়াই থেকে তিন ফুট উচ্চতার এমন চৈত্য পুরুলিয়ার অন্যত্র, ছড়রা, বারমাস্যা, বড়রা প্রভৃতি অঞ্চলেও দেখতে পাওয়া যায়। জে ডি বাগলার পাকবিড়রাতে যে চৈত্য দেখেছিলেন, তার চার পাশে খোদিত ছিল মহাবীরের মূর্তি। স্থানীয় 'দাঁদড়' পত্রিকা গোষ্ঠী ও সচেতন মানুষজন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন বলেই অবহেলার পাকবিড়রা এখন জেলার উল্লেখযোগ্য পর্যটনকেন্দ্র।

সুপণ্ডিত বিনয় ঘোষ পুরুলিয়ায় ক্ষেত্রসমীক্ষা করেছিলেন, সঙ্গী ছিলেন পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের বাংলার শিক্ষক শান্তি সিংহ। শান্তিবাবু জানাচ্ছেন, "পুরুলিয়ার আনাই জামবাদ, লৌলাড়া থেকে বড়াম প্রভৃতি গ্রামে সরেজমিন সমীক্ষায় গিয়ে দেখেছি অনেক জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি। সে সব প্রস্তর মূর্তি নির্জন বৃক্ষচ্ছায়ায় কিংবা গ্রামের মাঝে কোনও খোলামেলা জায়গায় ভক্তিসহ রেখেছেন গ্রামবাসীরা। তবে জৈন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বিশেষত আমলক, বেঁকি কিংবা চৌকা পাথরখণ্ড গ্রামের কেউ কেউ গৃহপ্রাঙ্গণে কিংবা খড়ের পালইয়ে তলার পাটাতন হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করে চলেছেন।" তিনি পাকবিড়রাতে দেখেছিলেন জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তিগুলিকে গ্রামবাসীরা 'কালভৈরব' নামে পূজা করেন, এমনকি দেবতাকে প্রসন্ন করতে বলিদান পর্যন্ত চলে। অহিংসার পথ অনুসরণ ও সর্বপ্রকার জীবসত্তার প্রতি করুণা প্রদর্শন যে জৈন ধর্মের মূল কথা, তার তীর্থঙ্করদের মূর্তি পূজিত হচ্ছেন বলির রক্তপাতে ইতিহাস তার কাল পরিক্রমণে চোরাপথের নানা বাঁকে কোন ইশারা রেখে দেবে, তার আন্দাজ দেবেন কোন দেবতা!

চব্বিশতম তীর্থঙ্কর মহাবীর ও তাঁর অনুগামীরা জৈন ধর্ম প্রচারের জন্য প্রাচীন বঙ্গদেশ থেকে ক্রমশ পশ্চিম ভারতে যাবার চেষ্টা করেছিলেন। তাই রাঢ়ভূমি সমেত প্রাচীন বঙ্গের বহু স্থানে জৈন ধর্মের প্রসার ঘটে। বাংলাদেশের বগুড়া জেলার মহাস্থানগড় খ্রিস্টজন্মের তিনশো বছর আগে জৈন মতাবলম্বীদের বড় কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল, তখন তার নাম ছিল পুণ্ড্রবর্ধন। হাজারিবাগের পরেশনাথ পাহাড়কে জৈন ধর্মগ্রন্থে 'সমেতশিখর' বলা হয়েছে। এই পবিত্র শিখরে চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের মধ্যে কুড়ি জন (কারও মতে উনিশ জন) সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। একে কেন্দ্র করে মানভূম-পুরুলিয়ার বড়াম, সুইসা, দেউলি, শীতলপুর, দেউলঘাট, আনাই, বুধপুর, পাকবিড়রা, লৌলাড়া, ছড়রা, পারা, কাশীপুর, মৌতড়-বান্দা প্রভৃতি অঞ্চলে জৈন সংস্কৃতির অনিন্দ্য চিহ্ন আজও অবহেলার ও ঐতিহ্য ধ্বংসের সাক্ষী। জৈন ধর্মাবলম্বী শ্রাবক সম্প্রদায় পুরুলিয়ায় 'শরাক' নামে পরিচিত। শরাকেরা বাণিজ্য ও মহাজনি ব্যবসা করতেন। প্রচুর বিত্তসম্পদের একটা বড় অংশ তারা জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠায় ব্যয় করেছিলেন। জৈন ধর্মগ্রন্থ 'আচারাঙ্গসূত্র' থেকে জানা যায়, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে তীর্থঙ্কর মহাবীর ঘন জঙ্গলে পরিবৃত 'রাঢ়া' অঞ্চলের অসভ্য জাতিকে নবজ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করতে সেই অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছিলেন। তখন স্থানীয় মানুষেরা মহাবীরের পিছনে কুকুর লেলিয়ে দেয়। রাঢ়াঞ্চল সে কালে বজ্রভূমি ও সুহ্মভূমি, এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। রুক্ষ প্রকৃতির পুরুলিয়া ছিল বজ্রভূমির অন্তর্গত। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সরকার মনে করেন মহাবীরের পিছনে কুকুর লেলিয়ে দেবার কাহিনি হয়তো অপপ্রচার। রাঢ়া অঞ্চলের মানুষ জৈন ধর্মের দ্বারা সুসভ্য হয়েছিল, এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার্থে কুকুর-কাহিনির উদ্ভব।

জৈনমূর্তি চেনার সহজ উপায়, এই মূর্তির মাথায় জটা থাকে। আবার তন্ত্রের প্রবক্তা শিব, জৈন ও বৌদ্ধ সকলেরই উপাস্য। প্রাচীন নামে 'ঈশ্বর' যুক্ত থাকলে বুঝতে হবে তা জৈন শিব ('নাথ' থাকলে বৌদ্ধ শিব)। জৈন মন্দিরগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল দু'টি পাথরকে অনড় ভাবে আটকে রাখার জন্য লোহার আংটার ব্যবহার হত, বাইরে থেকে তা দেখা যায় না। পুরুলিয়ার প্রাচীন প্রত্নভূমি ক্রোশজুড়ি গ্রামের সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দিরটি নিয়ে বিতর্ক আছে। নামের কারণে অনেকেই মনে করেন এটি জৈন মন্দির

এরপর ২১ পাতায় ▶

পুরানিদর্শন পাকবিড়রা গ্রামের জৈন দেউল স্থাপত্য।

তীর্থঙ্করের বিগ্রহ

বিধানসভা ভোটের
জেলাভিত্তিক ফলাফল

কোচবিহার	মোট আসন ৯	২	৭	
আলিপুরদুয়ার	মোট আসন ৫	০	৫	
জলপাইগুড়ি	মোট আসন ৭	৩	৪	
কালিম্পং	মোট আসন ১	০	০	১
দার্জিলিং	মোট আসন ৫	০	৫	
উত্তর দিনাজপুর	মোট আসন ৯	৭	২	
দক্ষিণ দিনাজপুর	মোট আসন ৬	৩	৩	
মালদহ	মোট আসন ১২	৮	৪	
মুর্শিদাবাদ	মোট আসন ২০	১৮	২	
নদিয়া	মোট আসন ১৭	৮	৯	
উত্তর ২৪ পরগনা	মোট আসন ৩৩	২৮	৫	
দক্ষিণ ২৪ পরগনা	মোট আসন ৩১	৩০	০	১
কলকাতা	মোট আসন ১১	১১	০	
হাওড়া	মোট আসন ১৬	১৬	০	
হুগলি	মোট আসন ১৮	১৪	৪	
পূর্ব মেদিনীপুর	মোট আসন ১৬	৯	৭	
পশ্চিম মেদিনীপুর	মোট আসন ১৫	১৩	২	
ঝাড়গ্রাম	মোট আসন ৪	৪	০	
পুরুলিয়া	মোট আসন ৯	৩	৬	
বাঁকুড়া	মোট আসন ১২	৪	৮	
পূর্ব বর্ধমান	মোট আসন ১৬	১৬	০	
পশ্চিম বর্ধমান	মোট আসন ৯	৬	৩	
বীরভূম	মোট আসন ১১	১০	১	

আনন্দবাজার পত্রিকা

এ বার কোভিড-যুদ্ধে গতি শিল্পাঞ্চলে

অষ্টম দফার ভোট শেষ হতেই শুক্রবার থেকে কোভিড মোকাবিলার কাজে যেন গতি এল ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে। তবে আগামী ২ মে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণার পরে নতুন সরকার তৈরি না হওয়া পর্যন্ত পুর পরিষেবার কাজ কী ভাবে হবে, তা নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছেই পুরসভাগুলিতে।

শুক্রবারই নৈহাটি পুরসভা তাদের সেফ হোম চালু করেছে। প্রথম দিনেই সেখানে ২৫ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন। নৈহাটির বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়ামে চালু হয়েছে ওই সেফ হোম। পুর প্রশাসক অশোক চট্টোপাধ্যায় জানান, তাঁরা শয্যা বাড়িয়ে ১৭৫ পর্যন্ত করার লক্ষ্যমাত্রা রেখেছেন। আপাতত পুর এলাকার রোগীদেরই সেখানে রাখা হবে। তাঁর কথায়, "গত বছর মুর্শিদাবাদ, রানাঘাটের মতো এলাকা থেকে আসা রোগীদেরও এখানে রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। নতুন সরকারের দিকে তাকিয়ে আছি। যদি সেই সরকার নির্দেশ দেয়, তবে নৈহাটির বাইরের রোগীদেরও জায়গা দেওয়া হবে।" যদিও নতুন সেফ হোমেও অক্সিজেনের আকাল রয়েছে বলেই দাবি অশোকবাবুর।

গত বছর সংক্রমণের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় সংক্রমিতদের চিকিৎসায় নৈহাটির এই স্টেডিয়ামে সেফ হোমটি চালু করেছিল পুরসভা। চলতি বছরের শুরুতে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আসায় সেটি বন্ধ করা হয়।

এ দিনই নৈহাটি পুরসভার উদ্যোগে রামঘাট শ্মশানে একটি নতুন বৈদ্যুতিক চুল্লি চালু করা হচ্ছে। পুর প্রশাসক জানান, ওই শ্মশানে মোট দু'টি চুল্লি হল। নতুন চুল্লিতে সাধারণ দেহ সৎকার হবে, পুরনোয় কোভিড দেহ সৎকার হবে।

উল্লেখ্য, আট দফার নির্বাচনের জেরে রাজ্যের অন্যান্য জায়গার মতো দীর্ঘদিন ধরেই ব্যারাকপুর, উত্তর ব্যারাকপুর, নৈহাটি, গাড়ুলিয়া, জগদ্দল, হালিশহর, কাঁচরাপাড়া পুরসভা কোভিড মোকাবিলার কাজে সক্রিয় ছিল না। স্থানীয় থানাগুলি নিজ নিজ এলাকায় খানিকটা সেই কাজে করে পরিস্থিতি সামলেছিল।

ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ বলেন, "পুলিশের তরফে এলাকায় মাস্ক পরা, দূরত্ব-বিধি মেনে চলা, জমায়েত না করা-সহ নানা বিষয় নিয়ে মাইকে প্রচার করা হচ্ছে। কেউ সমস্যা নিয়ে থানায় ফোন করলেই পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নিচ্ছে।"

লোকসভা নির্বাচনের পরে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে রাজনৈতিক সমীকরণ খানিকটা বদলে গিয়েছে। করোনার মোকাবিলায় কোনও নির্দেশ মানার জন্য কাউকে বাধ্য করতে দ্বিধায় রয়েছে পুরসভাগুলি। তাই পুর কর্তৃপক্ষেরা চেয়ে রয়েছেন রাজ্যের সরকার গঠনের দিকে। প্রসঙ্গত, এ দিন থেকেই রাজ্য সরকার সর্বত্র বাজার খোলা রাখার সময়সীমা অনির্দিষ্টকালের জন্য বেঁধে দিয়েছে।

কাঁচরাপাড়া পুরসভার পুর প্রশাসক সুদামা রাও বলছেন, "করোনার মোকাবিলা কী ভাবে সম্ভব, তা নিয়ে এলাকায় প্রচার চলছে। ভোটের ফলাফল প্রকাশের পরে পুলিশের সঙ্গে যৌথ ভাবে বৈঠক করে কর্মসূচি ঠিক করা হবে।" সরকারি নির্দেশিকার প্রতীক্ষায় উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার চেয়ারম্যান মলয় ঘোষও। তিনি বলেন, "পুরসভাগুলি কী ভাবে কাজ করবে, সে জন্য সরকারি নির্দেশিকার প্রয়োজন। না হলে এক-এক জন এক-এক ভাবে কাজ করলে সমাধান হবে না।"

ঝাড়খণ্ডের হাতির হানায় অযোধ্যা পাহাড়তলির বনাঞ্চলে নষ্ট ফসল

হাতির হানা থেকে ফসল বাঁচাতে প্রখর গ্রীষ্মেও গাছের উপরে মাচা করে পাহারা দিতে হচ্ছে গ্রামের কৃষকদের। তা সত্ত্বেও তাদের দাপটে নষ্ট হচ্ছে ফসল। ঝাড়খণ্ডের হাতির হানায় রীতিমতো ত্রস্ত পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়তলির দুই বনাঞ্চলের একাধিক গ্রাম।

পুরুলিয়া বন বিভাগ সূত্রে খবর, সোমবার রাতে ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগের ১২টি হাতির ১টি দল মাঠা রেঞ্জ এলাকায় ঢোকে। ওই দলে ২টি শাবক-সহ ১টি দাঁতাল রয়েছে। সোমবার রাতে ওই দলটি প্রথমে কুদনা বিট এলাকার কুদলুং এবং চিকনবাগান এলাকার প্রায় ১ হেক্টর গ্রীষ্মকালীন সব্জি সাবাড় করে দেয়। হাতির হানায় অনেকটা ফসলও নষ্ট হয়। এর পর পাশের বাগমুন্ডি রেঞ্জের খটকাদি, বেলতার এবং কিতাদি গ্রাম সংলগ্ন এলাকাতেও প্রায় ১ হেক্টর সব্জি এবং বোরো ধান নষ্ট করে হাতির দলটি।

সারারাত ধরে দাপিয়ে বেড়ানোর পর মঙ্গলবার ভোরে হাতির দলটি অযোধ্যা পাহাড়ের সুক্রি ডভা এলাকায় গা ঢাকা দেয়। মঙ্গলবার মাথা রেঞ্জ আধিকারিক পল্লব পাল বলেন, "সোমবার রাতে ঝাড়খণ্ড থেকে ওই দলটি আমাদের রেঞ্জ এলাকায় ঢোকে। ফসল নষ্ট করার পর বাগমুন্ডি এলাকায় চলে যায়। আমরা ওই দলটির ওপর নজর রেখেছি।" বাগমুন্ডি রেঞ্জের আধিকারিক আলমগীর হক বলেন, "মাঠা এলাকায় ক্ষয়ক্ষতি ছাড়া আমাদের রেঞ্জ এলাকাটিও হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বন দফতরের হিসাব অনুযায়ী কৃষকরা ক্ষতিপূরণ পাবেন। হাতির হানার যাতে আরও গ্রীষ্মকালীন ফসল এবং বোরো ধান নষ্ট না হয়, সে জন্য আমরা সব রকম চেষ্টা করছি। চাষিরাও তাঁদের জমির পাশে গাছে মাচা বেঁধে রাতপাহারা শুরু করেছেন।'

সরকারি নজরদারি এড়িয়ে কালোবাজারি
১ লক্ষ ৮০ হাজারেও বিক্রি হচ্ছে রেমডেসিভির

▶ প্রথম পাতার পর

হাসপাতালে ১৪০ জন সঙ্কটাপন্ন রোগী আছেন। প্রত্যেকেরই রেমডেসিভিয়ার দরকার। কিন্তু ড্রাগ কন্ট্রোলের নজরদারিতে মাত্র ৯০টি ওষুধ পেয়েছে হাসপাতাল। তা হলে বাকি ৫০ জনের কী হবে?

"আমরা রোগীর পরিবারকে আমাদের অসহায়তার কথা জানাচ্ছি, প্রিয়জনকে বাঁচাতে বাড়ির লোক যে-কোনও ভাবে ওষুধ সংগ্রহের চেষ্টা করছেন। তারই সুযোগ নিচ্ছে কালোবাজারিরা," বলেন হাওড়ার এক বেসরকারি হাসপাতালের কর্তা।

২৮ এপ্রিল কসবা থানায় এমনই এক কালোবাজারির বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেন স্থানীয় বাসিন্দা দেবাঞ্জলি ভট্টাচার্য। তিনি জানান, তাঁর বাঁকুড়াবাসী এক বন্ধুর ক্যানসার-আক্রান্ত মায়ের করোনা হয়েছে। তাঁকে ভর্তি করানো হয় দুর্গাপুরের এক বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে। অভিযোগ, তারা ছ'টি রেমডেসিভিয়ার কিনতে বলে বাড়ির লোককে। বিভিন্ন দিকে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। দেবাঞ্জলিদেবী বললেন, "এক পরিচিত ব্যক্তি পার্ক সার্কাসের এক জনের ফোন নম্বর দেন। ফোন করলে ৫৪০০ টাকার ওষুধের জন্য তিনি এক লক্ষ ২০ হাজার টাকা চান এবং রাজি থাকলে টাকা নিয়ে কোয়েস্ট মলের সামনে হাজির হতে বলেন। আমরা তখন ১০০ ডায়াল করে লালবাজারে অভিযোগ জানাই। তার পরে কসবা থানায় লিখিত অভিযোগ করি।" দেবাঞ্জলিদেবী জানান, অন্য এক জন ৯০ হাজার টাকার বিনিময়ে গিরিশ পার্ক মেট্রো স্টেশনের সামনে থেকে ছ'টি ওষুধ সংগ্রহ করতে বলেন।

একাধিক রোগীর আত্মীয়ের কাছ থেকে একটি নম্বর পেয়ে লেকটাউনের এক ব্যক্তির সঙ্গে আনন্দবাজারের তরফে রোগীর আত্মীয় সেজে ফোন করা হয়েছিল। সেই ব্যক্তি ফোন ধরে হিন্দিতে বলেন, "সপ্তাহ দুয়েক আগেও অনেক ওষুধ ছিল। এখন কড়াকড়ি বেড়েছে। দু'টির বেশি ওষুধ দিতে পারব না। এক-একটি ওষুধের জন্য ৩০ হাজার টাকা লাগবে।"

দিন চারেক আগে অভিযোগ পেয়ে ড্রাগ কন্ট্রোলের কর্তারা অভিযান চালান। পার্ক স্ট্রিটের এক মহিলার খোঁজ মেলে, যিনি একটি অনলাইন ফার্মাসির সঙ্গে যুক্ত। জিজ্ঞাসাবাদের মুখে তিনি স্বীকার করেন, এক জন তাঁকে কিছু রেমডেসিভিয়ার এনে দেবেন বলেছেন। প্রতিটির জন্য ১৮ হাজার টাকা লাগবে। সেগুলি তিনি পরে আরও বেশি দামে বেচবেন। ওই মহিলাকে দিয়ে ফোন করিয়ে সেই ব্যক্তিকে নিউ মার্কেটের সামনে ডেকে পাঠানো হয় এবং ওষুধ দেওয়ার সময় গ্রেফতার করা হয় হাতেনাতে। লোকটি নিউ মার্কেট চত্বরের একটি নামী ওষুধের দোকানের কর্মী এবং তাঁর দেওয়া রেমডেসিভিয়ার বাংলাদেশের। সংশ্লিষ্ট ওষুধের দোকানের মালিকের বক্তব্য, তিনি এর কিছুই জানেন না। অভিযুক্ত কর্মচারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

অ্যাপোলো গ্লেনেগলস এবং ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক জানিয়েছে, তাদের রেমডেসিভিয়ারের অভাব নেই। তবে মারাত্মক আকাল করোনার অন্য গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ টসিলিজুম্যাব, ইটোলিজুম্যাবের। ওগুলো একেবারেই মিলছে না। দুর্গাপুর মিশন হাসপাতাল জানাচ্ছে, তারা যত রেমডেসিভিয়ার চাইছে, পাচ্ছে তার মাত্র ২৫ শতাংশ।

DR. SANKAR GHOSH ELECTED TO NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES

Dr. Sankar Ghosh was born and brought up in Calcutta, now Kolkata, from where he did his BSc, MSc, Calcutta University, India, 1981; M.S. Albert Einstein College of Medicine, New York (Yeshiva University), 1984; He received his PhD, from Albert Einstein College of Medicine, New York, in 1988, and thereafter he did his postdoctoral work at the Whitehead Institute, Cambridge, Massachusetts (MIT), under the supervision of Nobel laureate David Baltimore (1989–1991).

Dr. Dola Ghosh, wife of Sankar Ghosh, is also a prominent personality in scientific world and an excellent singer.

Dr. Sankar Ghosh is an Indian immunologist and microbiologist, who is the chair of the Department of Microbiology & Immunology at Columbia University Medical Center. Previously he has remained a Professor of Immunobiology, Molecular biophysics and Biochemistry, and Molecular, Cellular & Developmental biology, and researcher working at Yale University for 17 years.

Award-winning immunologist Sankar Ghosh, PhD, was elected to the National Academy of Sciences in recognition of his distinguished and continuing achievements in original research. Ghosh is the Silverstein and Hutt Family Professor of Microbiology and chair of the Department of Microbiology & Immunology at the Vagelos College of Physicians and Surgeons. He is among 120 newly elected members announced by the Academy today, April 26, 2021.

Ghosh's research examines the connection between the immune system and various diseases, from cancer to sepsis to diabetes and more. He has a deep interest in deciphering the complexities of transcriptional regulation—the ways by which a cell regulates the conversion of DNA to RNA—to better understand the mechanisms of the immune system and the pathological changes that occur to its pathways in many diseases.

Most recently, Ghosh and members of his lab uncovered NEW CLUES TO SEPSIS that may speed diagnosis. They identified two microRNAs produced in immune cells during prolonged inflammation and found that in a mouse model of sepsis, these microRNAs suppressed the immune system at a critical time when a full immune response was needed. Their findings suggest the two microRNAs could inform a test to help physicians classify patients into those with milder infections versus others with organ failure who are at high risk of sepsis and death.
While conducting postdoctoral research early in his career, Ghosh produced seminal work in understanding the regulation of Nuclear Factor-kappa B, a transcription factor with an important role in regulating the expression of many genes involved in the immune system.

Ghosh joined Columbia in 2008. He was previously a Howard Hughes Medical Institute Investigator and is also a fellow of the American Association for the Advancement of Science.

The National Academy of Sciences is a private, nonprofit institution that was established under a Congressional charter signed by President Abraham Lincoln in 1863. It recognizes achievement in science by election to membership and, with the National Academy of Engineering and the National Academy of Medicine, provides science, engineering, and health policy advice to the federal government and other organizations.

NEW CLUES TO SEPSIS May Speed Diagnosis

Sepsis is an infection that kills as many Americans each year as stroke and Alzheimer's combined--about 250,000--but very little has changed in the treatment of this age-old scourge. "The best treatment for sepsis starts with rapid detection. Our results suggest that specific molecules called microRNAs may be potential biomarkers of poor prognosis, indicating the need for more aggressive treatment options," explains the study's senior leader Sankar Ghosh, PhD, the Silverstein and Hutt Family Professor of Microbiology & Immunology and chair of the Department of Microbiology & Immunology at Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons (VP&S).

NEXT GENERATION

SANJOY DUTTA , SON OF LONG TIME CAB MEMBER SAMIR K. DUTTA

Sanjoy Dutta, M.D. is a graduate of Yale University and Harvard Medical School. He completed his surgical and research training at the University of California, San Francisco, and has been practicing general and bariatric (weight loss) surgeon for the past 15 years . During this time he has been involved in medical research and publications, and has counseled thousands of patients on weight loss and health.

During his free time he enjoys writing, drawing, exercising, and occasionally participating in sprint triathlons. He currently lives in Northern California with his wonderful wife, daughters and two dogs. He is immensely grateful to live in a world where all can be 50 years old and appreciate life more than ever.

GET STRONG LIFE

By Dr. Sanjoy Dutta

Being healthy, fit, and strong lifelong is easier than you think. Doctors often stress the importance of being healthy, but they don't give you the specifics on what to do. And most exercise and diet programs require an unrealistic amount of time and commitment.

This book will tell you what you can do to dramatically improve your fitness (and look great) in a realistic, practical, time efficient, and achievable way. It requires awareness and some willpower, but you can be much more successful than you realize if:

1. You can set aside about 3 hours a week (total) for exercise most weeks.
2. You are willing to increase your awareness about how you eat, and willing to start making some straightforward easy to remember changes for the rest of your life.
3. You are willing to measure your progress and make small adjustments as needed.

You DO NOT have to devote unrealistic hours in the gym or follow ridiculous diets with too many rules. Don't waste your time trying to get a six pack, doing too many arm exercises, or getting obsessed with total body fat. The recommendations in this book are based on well accepted "honest" science and medical knowledge rather than poorly designed science, or "hot of the press" fad science. This book will start you off with a concrete exercise program and the most meaningful guidelines about how to choose food. By measuring your progress and making frequent small adjustments, eventually YOU DESIGN THE PROGRAM that works best for your body, your schedule, and your lifestyle. A program you can realistically enjoy and follow lifelong.

NABC GLOBAL Donors & Exhibitors Benefit

Max Exposure → Min Exposure

Donors	Premium	Prestige	Standard
Benefit	$1000	$500	$250
3D VR Platform Exposure	High	Medium	Low
Web Platform Promotion	High	Medium	Low
Email Blast	High	Medium	Low
Text Msg & Mobile Msg Blast	High	Medium	NA
Social Media Marketing	High	NA	NA

Exhibitor	Jewelry	Real Estate	General
Benefit	$1000	$500	$300
3D VR Booth	Extra Large	Large	Medium
Web Platform Promotion	High	Medium	Low
Email Blast	High	Medium	Low
Text Msg & Mobile Msg Blast	High	Medium	NA
Social Media Marketing	High	NA	NA

NABC GLOBAL Sponsorship Benefit

Max Exposure → Min Exposure

Sponsorship Types	Title Sponsors	Diamond Sponsors	Gold Sponsors	Silver Sponsors	Bronze Sponsors
Sponsor's Benefit	Please Contact	$10,000	$6,000	$4,000	$2,000
Stage Time	Max				→ Min
Content Marketing	Max				→ Min
Media Partner Promotion	Max				→ Min
3D VR Platform & Booth	Max				→ Min
Web Platform Promotion	Max				→ Min
Email Blast	Max				→ Min
Text Msg & Mobile Msg Blast	Max				→ Min
Social Media Marketing	Max				→ Min

Welcome to the Registration Page

NABC GLOBAL CONFERENCE

2021
July 2,3,4

An Initiative of CAB - NABC : USA & Global Partners

BIGGEST MUSICAL CONCERT & CULTURAL SHOWS

NABC GLOBAL 2021

GLOBAL BONGS GLOBAL NETWORK

NABC GLOBAL 2021 JULY 2, 3, 4

REGISTER BELOW

- STANDARD REGISTRATION
- SPONSORS REGISTRATION
- DONOR REGISTRATION
- PARTNER ORGANIZATION REGISTRATION
- EXHIBITOR REGISTRATION

Please visit: www.nabcglobal.org

REGISTRATION RATE – Pay By Credit Card or Bank Card or Bank Check or Zelle

STANDARD REGISTRATION	SPONSORS REGISTRATION	PARTNER ORGANIZATION REGISTRATION	EXHIBITOR REGISTRATION
$25 [Per Family]	BRONZE [$2,000]	$500 [For 2021 & 2022 Booth]	$300 [General Exhibitor]
DONOR REGISTRATION	SILVER [$4,000]	$200 [For 2021]	$500 [Real Estate]
$1,000, $500, $250	GOLD [$6,000]		$1,000 [Gold & Diamond Jewellery]
	DIAMOND [$10,000]		

Make Direct Payment Transfer to Bank, by Zelle or Post Check

Sponsors, Donors, Exhibitors can register by making direct payment to NABC account or by sending check to official address or by zelle transfer.

- **Send Check in USA**
  Check Drawn To : CAB or NABC
  Address : Mr. Ranadeb Sarkar; 346 Yale Road, Garden City, NY -11530
- **Send Direct Payment To BANK in USA**
  Acount name- CAB; Bank - Chase; Routing No - 021000021; A/C No -607286983
- **Send By Zelle**
  Email ranusarkar@hotmail.com

Zelle Payments

Send Details : please send all details [Name, Address, Contacts, types of sponsorship, payment details, photocopy of check, account or zalle transfer confirmation] of donors, sponsors , and exhibotrs to the following email address.
EMAIL : registration@nabcglobal.org

PLEASE SEE PAGE 12 FOR BENEFITS

Be Proud Sponsors, Patrons, Donors, Exhibitors of NABC GLOBAL

NABC GLOBAL Sponsorship Benefit

NABC GLOBAL Donors & Exhibitors Benefit

মহাপ্রভু হয়ে উঠেছিলেন স্বয়ং ভারতবর্ষ

বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

শিবচতুর্দশীর পরদিন মৌনী অমাবস্যা। রাত্রি প্রভাতে শুক্লপক্ষের প্রতিপদে আরম্ভ হবে মাধবপক্ষ, পক্ষের পূর্ণতিথি পূর্ণিমায় মাধবের রঙ খেলা, হোলি-উৎসব, আবীরে রঙে কুমকুমে পৃথিবী রাঙা হয়ে যাবে বসন্ত আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই ফুটতে শুরু করেছিল যে রাঙা পলাশস্তবক তার ঝরার পালা শুরু আজ থেকে। রাঙা পলাশ শুকিয়ে রঙে পরিণত হবে, তারই কণা উড়িয়ে বাতাস খেলবে হোলি। সংকল্প করে যারা মাধবার্চনা করবে তারা এই অমাবস্যার রাত্রিতে স্নান করে ঝরা পলাশ কুড়িয়ে আনবে,

রোদে শুকিয়ে গুঁড়ো করে তাই দিয়ে তৈরি করবে মাধবরঞ্জনের জন্য রাঙা রঙ। দোল-পূর্ণিমা হোলি-উৎসব। ভগবান বিষ্ণুর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ যাত্রার শ্রেষ্ঠ যাত্রা দোলযাত্রা। দ্বাপরে কানহাইয়ালালের ব্রজলীলার শ্রেষ্ঠলীলা দোললীলা, ভারতের বসন্তোৎসব হোলি; বাংলার প্রাণচৈতন্য শচীনন্দন মহাপ্রভুর জন্মতিথি।"

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহু উপন্যাস মলুটির রাজবাড়িতে বসে লেখা, যেটা ঘটনাচক্রে আমার দাদুর বাড়ি। এই উপন্যাসটাও সেখানেই লেখা কি না আমার জানা নেই, কিন্তু তখনও ট্যুরিস্ট স্পট না হয়ে ওঠা বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমান্তের ওই গ্রামের অসংখ্য শিবমন্দিরের একটির সিঁড়িতে বসে আমার সদ্যপ্রয়াত ছোটমামা শিল্পরসিক সতীনাথ রায় আমাকে বলেছিলেন যে, তারাশঙ্করের 'রাধা' উপন্যাসে মলুটির কথাও আসতে পারত, কারণ নীলাচলে যাবার পথে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য মলুটিতে পা রেখেছিলেন বলে অনেকের বিশ্বাস।

হয়তো রেখেছিলেন, নবদ্বীপ থেকে পুরী যাবার পথে বিশ্রাম নিয়েছিলেন ক্ষণকাল, হয়তো বা রাখেননি। আমার কাছে তার চেয়েও অনেক বেশি কৌতূহলকর ঘটনা হল, মলুটি গ্রামে ষড়ভুজ কৃষ্ণমূর্তির উপস্থিতি। সম্প্রতি গবেষক তুহিন মুখোপাধ্যায়ের বইয়ে পড়লাম, ষড়ভুজ কৃষ্ণমূর্তি মলুটি ছাড়া আর কোথাও নেই। অবশ্য তুহিনবাবু মনে করেছেন যে, মূর্তিটি শ্রীচৈতন্যেরও হতে পারে, যেহেতু ষড়ভুজ চৈতন্যের মূর্তি (যেখানে চৈতন্যের দু'টি হাত রামের, দু'টি কৃষ্ণের এবং দু'টি চৈতন্যের নিজের) কাটোয়া-বাঁশবেড়িয়াতেও দৃশ্যমান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন মলুটিতে বাস করা প্রবাদপুরুষ ডেভিড ম্যাককাচ্চনও এই রকম ভেবেছিলেন বলে শুনেছি। তবে, তুহিনবাবু দামি একটি কথা বলেছেন, মলুটির কৃষ্ণমূর্তি চৈতন্যের হলেও তা দুর্লভ, কারণ গৌরাঙ্গের শিঙাধারী ষড়ভুজ মূর্তি আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায়নি।

গেলেই বা কী হত? 'যা আর কারও কাছে নেই তা আমার কাছে আছে' এই উপলব্ধি একটি 'বাতাসা'কে নিয়েও যদি হয়, তবুও তা 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা'রই ভিন্ন রূপ। তার চেয়ে, 'নাস্তিগহ্বরের মধ্যে থেকে উঠে আসা সর্বহারা' অধিক চৈতন্যস্বরূপ নয়?

আমার বাবার ছোটমামার ঢাকা শহরে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষক হিসেবে অল্পস্বল্প নামডাক ছিল। এক বার কোনও একটি অনুষ্ঠান উপলক্ষে ঢাকায় আসা রবীন্দ্রনাথের পায়ে নিজের হারমোনিয়াম ছুঁইয়ে এনেছিলেন, এই ছিল ওঁর সর্বোচ্চ গর্ব। কিন্তু কেবল মাত্র সেই হারমোনিয়ামটা কাঁধে করে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে চলে আসার সময় সীমান্ত-ভক্ষকদের নজরে পড়ে যান উনি। ভিতরে করে সোনাদানা নিয়ে যাচ্ছে, এই সন্দেহে হারমোনিয়ামটাকে ফালাফালা করে দেয় তারা। সেই ঘটনার পরই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল মানুষটার, মাঝে মাঝেই বিড়বিড় করতেন, "রবীন্দ্রনাথের পায়ে ছোয়াইয়া আনলাম তাও"

ওই হারমোনিয়ামের শোকে উনি এক রকম জেদ ধরেই দণ্ডকারণ্যে চলে যান, পরে তৎকালীন মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে গান গেয়ে ভিক্ষে করতেন বলে শুনেছি। জীবনের শেষ সময়টা আমাদের কাছে এসে ছিলেন আর তখনই ওই পাগলের ভিতরকার প্রদীপটাকে জ্বলতে দেখেছিলাম। কী অসহ্য লাগত, যখন উনি আমাদের বুড়ির ঘর পোড়ানোর ভিতর এসে শামিল হতেন; 'আজ আমাদের নেড়াপোড়া, কাল আমাদের দোল' থামিয়ে দিয়ে বলে উঠতেন, "সর্বশূন্যতার ধারে/ জীবনের পোড়ো ঘরে অবরুদ্ধ দ্বারে/ দাও নাড়া;/ ভিতরে কে দিবে সাড়া/ মূর্ছাতুর আঁধারের উঠিছে নিঃশ্বাস।/ ভাঙা বিশ্বে পড়ে আছে ভেঙে-পড়া বিপুল বিশ্বাস।/ তার কাছে নত হয় শির/ চরম বেদনাশৈলে ঊর্ধ্বচূড় যাহার মন্দির"

কার কবিতা, কেন বলছে, কিছুই জানতাম না সেই ছ'-সাত বছর বয়সে, কিন্তু নদীর স্রোতের প্রায় চলে যেতে যেতে 'যখন সময় থমকে দাঁড়ায়', সে রকমই কোনও এক পলে, আবু সয়ীদ আয়ুবের 'পান্থজনের সখা'-য় পঙ্‌ক্তিগুলো খুঁজে পেয়ে গায়ে কাঁটা দিয়েছিল তিরিশ বছর পরের এক মধ্যরাত্রে। চলে গিয়েছিলাম 'বীথিকা'র 'দুর্ভাগিনী' কবিতার কাছে, বার বার পড়েছিলাম তার শেষ দুটি পঙ্‌ক্তি, "অবিরাম প্রশ্ন জাগে যেন/ কেন ওগো কেন?"

না, কোনও উত্তর পাই না, কিন্তু একটা উপলব্ধি হয় যেখানে ওই দুর্ভাগা কৃষ্ণগোপাল মুখোপাধ্যায় 'দুর্ভাগিনী'র গলায় খুঁজে পেতে পারেন নিজ কণ্ঠস্বর, ঠিক যে রকম 'রাধা'কে নিজের অস্তিত্বে ধারণ করে কৃষ্ণের লাগি বেদনা-বিহ্বল হতেন গোরাচাঁদ। আমার ভিতরে তোমার বেদনা ধারণ করতে পারলে তবেই তো তোমাকে ঈশ্বর মনে হবে আমার, তবেই তো 'অ্যাই শোন' না বলে, 'বোল' বলতে পারব আমি! 'হল্লাবোল'-এর জনপ্রিয়তার কারণ সে 'হরিবোল' এর উত্তরসূরি, 'হরিবোল'-এর গর্ভেই তার জন্ম। মানুষকে 'হরি' ভাবো না, হরিকে বলতে দাও না বলেই তো 'হল্লা' বলে। ভারতবর্ষকে এই 'বোল' শব্দে রাঙিয়ে দিয়েছিলেন মহাপ্রভু

আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে। মানুষ অবাক বিস্ময়ে জেনেছিল যে তাদের বোবা-কালার মতো শুনতে বলছে না কেউ, অন্তরের আকুতিকে আত্মার উচ্চারণে রূপান্তরিত করতে বলছে। সেই প্রথম, 'মেটামরফোসিস', উপমহাদেশে।

"ইদমন্ধং তমঃ কৃৎস্নং জায়েত ভুবনত্রয়ম্/ যদি শব্দাহ্বয়ং জ্যোতিরাসংসারং ন দীপ্যতে"।

শব্দের জ্যোতি যদি সংসার জুড়ে না জ্বলত, তা হলে পৃথিবী ডুবে যেত অন্ধকারে। সেই অন্ধকার থেকে আমাদের পরিত্রাণ করার জন্যই রঙের মধ্যে রস মিশিয়েছিলেন গৌরাঙ্গ। আর সেই রস রং হয়ে ফুটে উঠেছিল ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। 'কিষানগড়ের রাধা' নামটার সঙ্গে আমরা অনেকেই পরিচিত। শিল্পী নীরদ মজুমদারের একটি প্রবন্ধও আছে এই বিষয়ে। কিন্তু কী ভাবে কিষানগড়ের রাধার মুখ বাঙালি তনয়ার মতো হল? নবদ্বীপের পণ্ডিতের প্রভাব কত দূর ছড়িয়েছিল যে, রাজপুতানার শিল্পীর তুলিতে গঙ্গামৃত্তিকার স্পর্শ লাগল? মীরাবাইয়ের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের দেখা হয়নি, কিন্তু চৈতন্যের দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত না হলে মীরা কি তাঁকে নিয়ে লিখতে পারতেন?

অধ্যাপক অচিন্ত্য বিশ্বাস দীর্ঘ দিন ধরে মীরার লিরিকগুলি বাংলায় অনুবাদ করছেন। তাঁর কাছেই পেলাম এই কবিতাটির সন্ধান, যেখানে মীরা বলছেন, "অব তো হরি নাম লৌ লাগী/ সব জগকে উও মাখনচোরা নাম ধরোয়ে বৈরাগী"। এই গানেরই শেষে মীরা বলছেন, "পীতাম্বর কী ভাব দিখাওই কটি কৌপীন কসৈ/ গৌর কৃষ্ণদাসী মীরা রসনা কৃষ্ণ বসৈ"। অচিন্ত্যবাবুর অনুবাদে শেষ পঙ্‌ক্তিটি হয়েছে, "গৌর-কৃষ্ণের দাসী মীরার রসনা গায় গোরাগুণ তন্ময়"। এই সূত্রেই আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের 'সাধক ও সাধনা' বইটির 'দোল-দুলাল শ্রীচৈতন্য' লেখাটির কথা এসে পড়ে। ১৩৪৪ সালের 'আনন্দবাজার বার্ষিক সংখ্যা'য় প্রকাশিত লেখাটির শুরুতেই পাচ্ছি, "বাংলার বাহিরেও বহুস্থানে চৈতন্যমতাবলম্বী বৈষ্ণব আছেন। গুজরাতে 'নওসারি' বিভাগে চৈতন্যমতাবলম্বী বৈষ্ণব আছেন। একবার দোলপূর্ণিমায় তাঁহাদের কীর্তনে শুনিতেছিলাম 'জয় জয় শ্রীচৈতন্য দোল-দুলাল'। দোলপূর্ণিমায় শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম। তাঁহারা দোল বলেন না, বলেন হোলি। তবু বাংলার অনুকরণে এই 'দোল-দুলাল' কথাটা বড়ো সুন্দর লাগিয়াছিল।"

ক্ষিতিমোহন সেনের এই লেখাটি শেষ হচ্ছে, মীরার একটি ভজন দিয়ে, "ফাগুনকে দিন যায় রে/ হোলি খেল অপার রে..."। শব্দগুলোয় ঘোর লেগে যায়। মনে হয়, মীরা যেন ভার্চুয়াল হোলিই খেলছেন। কত লেখায় পড়েছি যে সে কালে, হয়তো এ কালেও, বড়লোকরা আবির আর আতর এক সঙ্গে না করে হোলি খেলতে পারতেন না। কিন্তু সাধারণের বেলা, আকুলতাই একমাত্র সুগন্ধ। মীরা এখানে যেন সেই 'আতর'-এর কথাই বলছেন, "অন্তরকে পট খোল দিয়ো হৈ/ কঁহা পার কঁহা বার রে/ মীরাকে প্রভু পরম মনোহর/ চরণ কমল বলিহার রে"।

জীবন যখন শুকায়ে যায়, তখন এই আকুলতার সন্ধানেই উর মাটি চুর করি আমরা। করুণাধারা তো কোনও বড়বাবুর দিঘি নয়, করুণাধারা সেই স্রোত যা আমাকে কাঁদায় বলেই তোমাকে ভেজায়। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের সেই ট্রেন যেমন বাঁশি দিয়ে ভারতবর্ষের ভিতর হারিয়ে গিয়েছিল, নিমাই যেন বাঁশির টানে হারিয়ে গিয়েছিলেন এই ভারতে। আসলে হারাননি, ভারতকেই টেনে এনেছিলেন নিজের বাঙালিয়ানায়। ওড়িশার প্রতাপরুদ্র থেকে দাক্ষিণাত্যের রামানন্দ রায়, কিংবা উত্তর ভারতের পাঠানরা, যাঁরা গাত্রবর্ণ এবং উচ্চতা দেখে তাঁকে নিজেদের এক জন ভেবেছিলেন, শ্রীচৈতন্য তাঁর বাঙালি পরিচয় বাদ দিয়ে কারও সঙ্গে মেশেননি। শ্রীচৈতন্য রসাস্বাদনের প্রামাণ্য গ্রন্থ, কৃষ্ণদাস বিরচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' বাংলায় লিখিত। ওই বইয়ের কথায় একটু পরে আসছি, আগে অন্য একটি অনালোচিত দিকে আলো ফেলার প্রয়োজন।

শ্রীচৈতন্যর মুখের কথা, "নিজ প্রিয় স্থান আমার মথুরা বৃন্দাবন"। এই শিরোনামেই ইতিহাসবিদ তারাপদ মুখোপাধ্যায় যে বইটি লিখেছেন তাতে স্পষ্টই লেখা, "ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে বৃন্দাবন নির্জন বনস্থলী, দ্বিতীয়ার্ধে মন্দির পরিকীর্ণ তীর্থস্থলী। বৃন্দাবনের এই রূপান্তর চৈতন্যের প্রবর্তনায় এবং প্রধানত রূপ-সনাতন'সহ অন্য গৌরগণের উদ্যোগে। তাঁদের রচিত শাস্ত্রে, প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহে, আবিষ্কৃত তীর্থে পৌরাণিক বৃন্দারণ্য মধ্যযুগে নতুন গৌরবে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।"

এখান থেকে বলাই যায় যে, বৃন্দাবনে 'কানু সঙ্গ খেলে হোরী' অনেক অর্থেই বৃহত্তর ভারতে বাঙালির বিজয়পতাকা। চৈতন্য এবং তাঁর লীলাপার্ষদরা 'বর্জিত' ভাবতেন না উত্তর-পশ্চিম ভারতকে, উল্টো দিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদেরও 'বহিরাগত' তকমা পেতে হয়নি মথুরা-বৃন্দাবনে। বরং মথুরা-বৃন্দাবন হয়ে উঠেছিল, বাঙালি নবজাগরণের আউটপোস্ট।

এই 'হয়ে ওঠা' হয়ে উঠত না রাজশক্তির আনুকূল্য না পেলে। রাজা বিহারীমল, রাজা টোডরমল এবং অবশ্যই বীরবল বৈষ্ণবধর্ম এবং গৌরগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সেই শ্রদ্ধাই তাঁদের উদ্বুদ্ধ করে সম্রাট আকবরের কাছে শ্রীমৎ মহাপ্রভুর ভাবধারা পৌঁছে দিতে। ফলস্বরূপ বাংলার মানুষের তৈরি 'মদনমোহন মন্দির'-এ অম্বররাজ বিহারীমলের সুপারিশে সম্রাট আকবরের ফরমানে দু'শো বিঘে জমি দান। বৃন্দাবনের মন্দিরের ভূসম্পত্তি সেই প্রথম।

ইতিহাস এখানে থেমে যায়। ইতিহাস একে 'হিন্দু' দেবতার ভরণপোষণের জন্য 'মুসলমান' সম্রাটের দান হিসেবেই চিহ্নিত করতে চায়। কিন্তু কবিতা ইতিহাস থেকে উঠে এলেও ইতিহাসের বেড়াকে মানে না। তাই আমরা সম্রাট আকবরের আমলে জনপ্রিয়, এমন কবিতা পেয়ে যাই

"কানহা'তে অব ঘর ঝগড়ো পাসারো/ কৈসে ছয়ে নিরাওয়ারো।

ওয়হ সব ঘেরো করত হ্যায় তেরো রস/ অনরস কৌন মন্ত্র পড় ডারো

মুরলী বজায় কীনী সব বোরী/ লাজ দৈ তজ অপনে অপনে মে বিসারো।

তানসেন কে প্রভু কহত তুমহি সো

এরপর ১৫ পাতায় ▶

নিভৃতবাসের গল্প

গৌতম দে সরকার

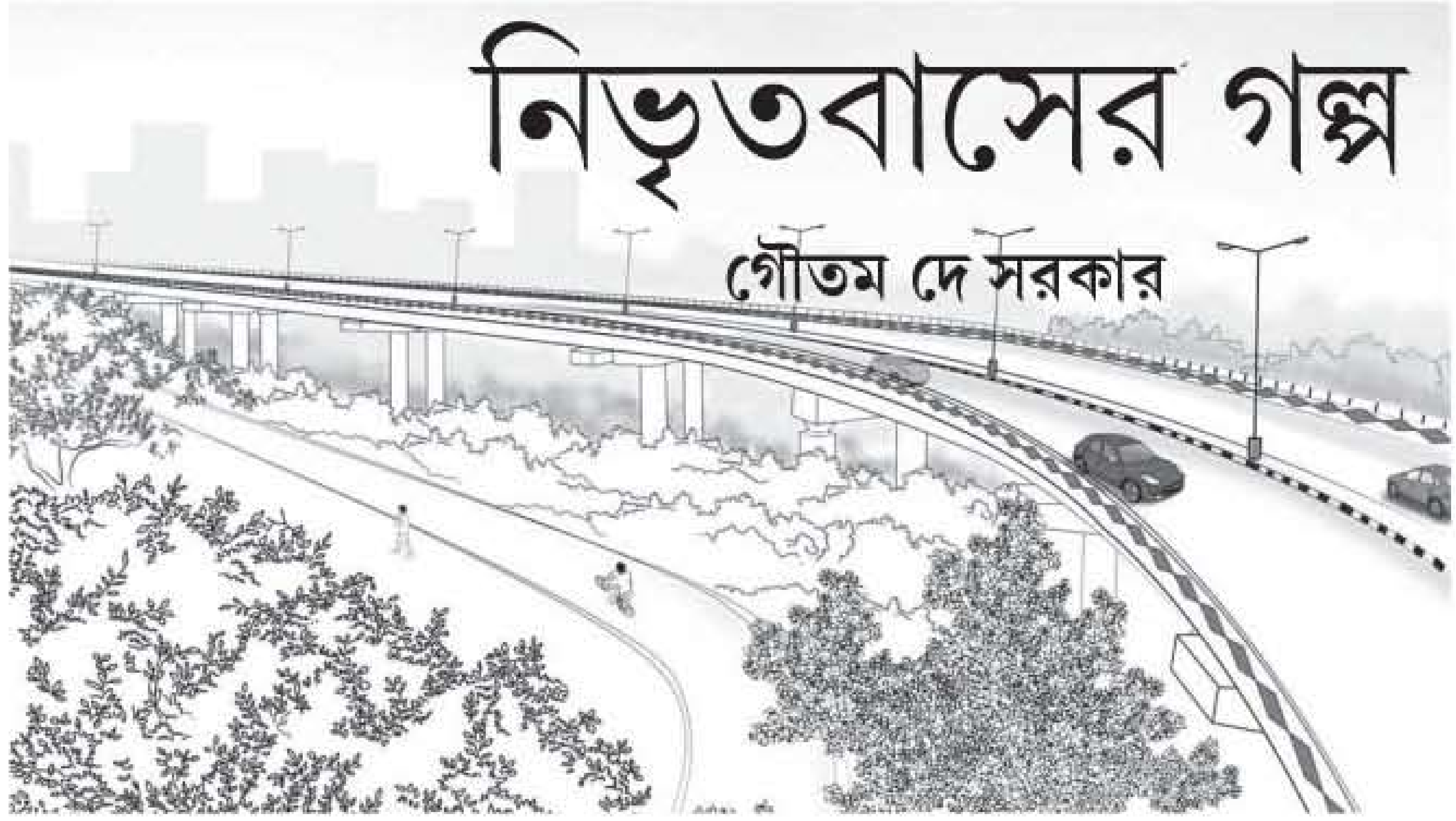

নিভৃতবাসের নিয়ম এখন শিথিল। তবু কলকাতার রাস্তাঘাট যথেষ্ট ফাঁকা। রেড রোডে ময়দানের পাশ দিয়ে গাড়ি বিনা বাধায় ছুটছে। আকাশে মেঘ। বৃষ্টি নামবে।

অতিমারির জন্য দীর্ঘ দিন গৃহবন্দি থাকার পর আজ একটু বেরিয়ে ভাল লাগছে সুতনুকার। বর্ষার জল পেয়ে ময়দানের ঘাসগুলো উজ্জ্বল সবুজ। চার পাশের পরিবেশ বড় নির্মল। গাড়িতে বসেই মোবাইলে ফোনে সবুজ নির্জন ময়দানের কয়েকটি ছবি তুলে নিল সে। ড্রাইভার বিশু বলল, "ম্যাডাম, গাড়ি থামাব?"

সুতনুকা বলল, "না, না, চলো। বৃষ্টি নামবে আবার।"

বিশু বলল, "সেভেন পয়েন্ট হয়ে মা ফ্লাইওভার হয়ে বাইপাস ধরব। তাড়াতাড়ি হবে।"

"যে ভাবে সুবিধে হয়, চলো। তুমি তো আগেও রাজডাঙায় সুভাষিণীর বাড়ি এসেছ।"

"হ্যাঁ ম্যাডাম। দু'বার।"

সুতনুকা কয়েকটি সামাজিক পরিমণ্ডলের সঙ্গেও যুক্ত। আজ দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর সারা দিনের খবরে চোখ বোলাচ্ছিল, তখনই সুভাষিণীর ফোন এল।

"হ্যাঁ বল, সুভাষিণী! কত দিন পর ফোন করলি বল তো!"

"কেমন আছিস তুই তনু?"

"ভাল আছি রে। তোর হঠাৎ মনে পড়ল?"

"কী যে বলিস! রোজই সবার কথা মনে করি। তুই তো কত সংগঠনের কাজ নিয়ে সারা দিন ব্যস্ত থাকিস।"

"তা ঠিক। তুইও আয় না! তুই তো খুব ভাল আবৃত্তি করতিস। এক দিন আয় আমাদের কালচারাল ফোরামে। তোর ভাল লাগবে।"

"এখন সে সবও ভাল লাগে না আর। একা থাকতে থাকতে জীবনটাই ক্রমশ নিঃশব্দ হয়ে পড়েছে। সে ভাবে আর আলাপের মানুষজন কোথায়! কে-ই বা আমাদের মতো বৃদ্ধাদের সঙ্গে কথা বলবে বসে বসে।"

"বৃদ্ধা?" বলেই হাসল সুতনুকা।

সুভাষিণী বলল, "আমি রিটায়ার করে গেছি দু'বছর হল। ফিফটি এইট-এ। এখন প্রবীণ নাগরিক।"

"আমি কিন্তু সে ভাবে ভাবি না। বয়সের কথা ভাবিই না।"

সুতনুকাও রেলের উচ্চপদে চাকরি করেছে। রিটায়ার করল এ বছর। এখনও নিয়ম করে স্পা-তে যায়। রূপচর্চা বাদ পড়ে না। রান্না-বান্না ঘরের কাজ মিনতি এসে করে দেয়। নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত সারা দিন। অবসর সময় কাটে বই পড়ে।

তবুও জীবনের কোথাও যেন খামতি থেকে গেছে। স্রোতের বিপরীতে চলা খুব কঠিন। আজীবনের লড়াই। নিজের সঙ্গে নিজেরই।

মেয়ে রিয়াকে নিয়েই কাটছিল 'সিঙ্গল মাদার লাইফ'। শূন্যতা টের পেল রিয়ার বিয়ের পরেই।

রিয়াও কখনও বাবার কথা সে ভাবে জানতে চায়নি। জেনেছিল, মায়ের সঙ্গে বাবার বিয়ে হয়নি শেষ পর্যন্ত। মায়ের নিতান্ত এক ব্যক্তিগত মুহূর্ত, আবেগ বা যন্ত্রণায় তার আগমন। পিতার স্পর্শ ব্যতীত আর কিছুতেই অপূর্ণ নেই রিয়া।

এখন বিয়ের পর স্টেটসে আছে। কাজেই সুতনুকার হাতে এখন অনেক সময় নিজের জন্য। সময়গুলো বিভিন্ন অনুপাতে ভাগ করে নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখে বিভিন্ন কাজে।

সুভাষিণী বলল, "আজ সন্ধ্যায় কী করছিস রে?"

সুতনুকা একটু ভেবে নিয়ে বলল, "ফাঁকাই আছি।"

"তবে একটু আয় না রে আমার এখানে। জমিয়ে আড্ডা মারি। প্লিজ... তা ছাড়া আজ মিতিনের জন্মদিন।"

"কে মিতিন?" সুতনুকা বিস্ময় নিয়ে প্রশ্ন করল।

সুভাষিণী একাই থাকে সেই কবে থেকে। হঠাৎই বর মারা গেল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে। তখন ওর কত কম বয়স। ছেলেমেয়েও নেই। নিজে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে চাকরি করত। তাই মিতিন বলে কাউকে মনে করতে পারল না সুতনুকা।

সুভাষিণী বলল, "সব জানবি। সন্ধ্যায় আয়।"

সুতনুকা এ নিয়ে আর কথা বাড়ায়নি। মনে মনে ভাবল কোনও চাইল্ড অ্যাডপ্ট করল কি না! কিন্তু এই বয়সে এসে! করলে আরও আগেই উচিত ছিল। জিজ্ঞেস করল, "আর কেউ আসবে?"

"শ্যামা আসবে।"

"ও, শ্যামা! কোথায় থাকে ও?"

"ও থাকে গড়িয়ায়। রাণুও আসবে বলেছে।"

"হ্যাঁ রাণু! ফার্স্ট হত।"

"হ্যাঁ। কিন্তু মাধ্যমিকে তুই-ই হায়েস্ট পেয়ে স্কুলে ফার্স্ট হয়েছিলি।"

"এত বছর পরেও তুই কী সুন্দর সব মনে রেখেছিস সবাইকে।"

এরপর ২১ পাতায় ▶

মহাপ্রভু হয়ে উঠেছিলেন স্বয়ং ভারতবর্ষ

▶ ১৪ পাতার পর

তুম জীতো হম হারেঁ"

এই কবিতা অনুবাদের স্পর্ধা আমার নেই, শুধু প্রসঙ্গক্রমে বলি, ট্রেনে আলাপ হওয়া যে মুসাফিরের থেকে এই কবিতার কথা প্রথম শুনেছিলাম আমি, তিনি বিশেষ ভাবে খেয়াল করতে বলেছিলেন কবিতাটির শেষ পঙ্ক্তি, যেখানে কৃষ্ণকে তানসেনের প্রভু বলে উল্লেখ করে কবি তাঁর কাছে নিজের পরাজয় যাচনা করছেন। এখানে শিল্পীর ধর্ম যা খুশি হতে পারে, কিন্তু তার প্রভু কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণ, কারণ ওই এক জনের হাতেই যে বাঁশি আছে!

আমার কৈশোরে, কুড়ি-পঁচিশ জনের একটি সঙ্কীর্তনের দলের সঙ্গে, দোলপূর্ণিমার সকালে আমিও পথে বেরোতাম। কখনও খোল গলায় নিয়ে, কখনও বা করতাল হাতে। "প্রভাত সমীরে শচীর আঙিনা মাঝে গোরাচাঁদ নাচিয়া বেড়ায় রে" গানে মুখরিত হয়ে উঠত চার পাশ, বিশ্বপ্রকৃতির তাপ কমে যেত গোরাজননীর উল্লেখে। এই কবিতার অনুরণন আমায় কানে কানে বলে যে, সেই আঙিনা বন্যায় ভেসে গেছে, প্রলয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, পার্টিশনে ভাগ হয়ে গেছে, কিংবা প্রোমোটারের গ্রাসে চলে গেছে এ কেবল অর্ধসত্য; চিরসত্য এই যে সেই আঙিনা নিয়ত জন্ম নিচ্ছে। জন্ম নিচ্ছে সম্রাটের দরবারে, জন্ম নিচ্ছে কেরানির ছেঁড়া ছাতায়, জন্ম নিচ্ছে ধলেশ্বরী নদীতীরে।

মোগল দরবারে হোলি খেলার রমরমা সম্ভবপর হয়েছিল শ্রীচৈতন্যের ভক্তি ভাবামৃতের উচ্ছ্বাসে। সনাতন-রূপ-জীব প্রমুখ গোস্বামীর অলৌকিক সাধনা শুধু বৃন্দাবন, মথুরা তথা উত্তর ভারতের জনমানসকেই নয়, রাজশক্তিকেও প্রভাবিত করেছিল। এই ধারা আকবরেই শেষ হয়ে যায়নি। তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের বইয়ে পাচ্ছি, ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে কেশবদেব মন্দির ভেঙে মসজিদ নির্মিত হয়। মথুরার এই মন্দির দেখে ট্যাভারনিয়ের, বার্নিয়ার প্রমুখ পর্যটক মুগ্ধ হয়েছিলেন। এখানে তুমুল হোলিখেলা হত বলে জনশ্রুতি। কিন্তু ধ্বংসের অভিঘাত কি রং আর রসের উৎসব মুছে দিতে পেরেছিল?

কখনওই নয়। বরং ঔরঙ্গজেবের উত্তরপুরুষদের দ্বারাই ওই কাজ প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। তাই মহম্মদ শাহর কলমে আমরা পাই, "হোরী কি ঋতু আই সখী রী চলো পিয়া পে খেলিয়ে হোরী/ আবির গুলাল উড়াবত আওত শিরপর গাগর রস কি ভরী রী/ মহম্মদ শা সব মিল মিল খেলে মুখ

পর আবির মলো রী"-র মতো জীবন্ত অনুরাগের গান।

'সব মিল মিল কে' দোলযাত্রাকে সামনে রেখে এই বার্তাই মহাপ্রভু চারিয়ে দিয়েছিলেন আসমুদ্রহিমাচল। তাঁর মুখনিঃসৃত, " নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা" আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র কোনওটাই নই, নই ব্রহ্মচারী বা গৃহী বা বানপ্রস্থী অথবা সন্ন্যাসী। আসলে বলতে চেয়েছিলেন, 'আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে'। কিন্তু তিনি যে গৌরাঙ্গ! কী ভাবে মেশাবেন তিনি সবার রঙে রঙ?

আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের এক শহরে খোল-করতাল সমেত হরেকৃষ্ণ-হরেরাম করতে থাকা এক দঙ্গল সাহেব দেখে হেঁচকি উঠেছিল আমার। ঘর থেকে বেরিয়ে দৌড়ে গিয়েছিলাম তাঁদের সঙ্গে একটু কথা বলব বলে। উত্তর কলকাতার বাঙালি অভয়চরণ দে সত্তরের কাছাকাছি বয়সে আমেরিকায় পৌঁছে কী ভাবে এমন লাখো-লাখো শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ কৃষ্ণপ্রাণ তৈরি করলেন, কিনারা পাইনি ভেবে। 'ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনশাসনেস' বা ইসকন নিয়ে ভাল-মন্দ যা খুশি ধারণা থাকতে পারে কিন্তু তার বিপুল সর্বদেশীয় ভক্তমণ্ডলী বিস্ময়ের উদ্রেক করবেই। আমার আগে ধারণা ছিল যে, মূলত শ্বেতাঙ্গরাই এই সবের সঙ্গে যুক্ত কিন্তু আমেরিকায় কিছু দিন কাছ থেকে এদের একটি শাখার কাজ দেখে অন্য একটি সত্যের আবিষ্কারে চমৎকৃত হয়েছিলাম। শয়ে-শয়ে কৃষ্ণাঙ্গ ইদানীং কৃষ্ণকে আঁকড়ে ধরছেন কারণ একটি বিকল্প চেতনা। সেই চেতনার দারুণ প্রকাশ দেখেছিলাম শিকাগোর কয়েকটি ছেলেমেয়ের টি-শার্টে। 'এভরিওয়ান ক্যান সি/ মাই গড ইজ ব্ল্যাক লাইক মি'-র মতো লাইন লেখা ছিল টি-শার্টগুলোর বেশ কয়েকটায়। আর একটায় মার্টিন লুথার কিং, ম্যালকম এক্স এবং নন্দ ঘোষের বেটার ছবি এক সঙ্গে দিয়ে লেখা, 'মাই রিভোল্ট, মাই ড্রিমস, মাই গড'!

কৃষ্ণাঙ্গ জননেতা জেসি জ্যাকসন সেই যে বলেছিলেন, "...ফ্রম স্লেভশিপ টু কম্প্যানিয়নশিপ, ফ্রম আউটহাউস টু হোয়াইট হাউস আওয়ার জার্নি হ্যাজ জাস্ট বিগ্যান," অসম্মান থেকে সম্মানের দিকে দ্বিজশ্রেষ্ঠ চণ্ডালদের যাত্রা কিন্তু মহাপ্রভুই শুরু করে গিয়েছিলেন। টোনি কে স্ট্যুয়ার্ট, তাঁর 'দ্য ফাইনাল ওয়ার্ড' বইয়ে লিখেছেন, কেন্দ্রীয় কোনও নেতৃত্ব কিংবা সাংগঠনিক কর্তৃত্ব ছাড়া বৈষ্ণবসমাজ টিকে রয়েছে এবং ছড়াচ্ছে কারণ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'ই ঈশ্বরের ভূমিকা নিয়েছে। তাঁর মতের সূত্র ধরে ওই মহাগ্রন্থের কাছে ফিরে গিয়ে দেখতে পাই, "তৃষ্ণার্ত প্রভুর নেত্র ভ্রমর যুগল/ গাঢ় তৃষ্ণে পিয়ে কৃষ্ণের বদনকমল"। গৌরাঙ্গ নিজেকে সমর্পণ করছেন জগন্নাথের চরণে, 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার' এর পথিকৃৎ নয় কি

এই 'ব্ল্যাক গডস ম্যাটার'? মহাপ্রভু যে ব্রজের নিবাসী না হয়ে নীলাচলেই

রয়ে গেলেন, তার একটি কারণ হয়তো নীলাচলে উত্তর এবং দক্ষিণ দুই প্রান্ত থেকেই ভক্ত সমাগম হবার ফলে, গৌরাঙ্গ ভারতের সঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গ ভারতের মহাসঙ্গম সংঘটিত হত প্রতিনিয়ত।

শিব যেমন তাঁর জটায় গঙ্গার আগমনে ত্রস্ত সতীকে অঙ্গে ধারণ করে হয়ে উঠেছিলেন অর্ধনারীশ্বর, আলো আর কালোকে আপন সত্তায় ধারণ করে মহাপ্রভু হয়ে উঠেছিলেন ভারতবর্ষ স্বয়ং। সুকুমার সেনের মতানুযায়ী, সনাতন গোস্বামীর 'কৃষ্ণ একাই উপাস্য' তত্ত্ব স্বীকার না করে রূপ গোস্বামী যুগল রাধাকৃষ্ণকেই উপাস্য মনে করেছিলেন। আর কৃষ্ণদাসের কলমে রাধা-কৃষ্ণ যেন যুগনদ্ধ একমূর্তি দেবতা।

এই যুগল সত্তার উদ্‌যাপনই কি শ্রীরামকৃষ্ণকে দিয়ে বলিয়ে নেয়, 'অনন্ত রাধার মায়া কহনে না যায়/ কোটি কৃষ্ণ কোটি রাম, হয় যায় রয়'? মা সারদা তাই কি বাঁশির আওয়াজ শুনতে পেতেন 'দক্ষিণেশ্বরে রেতে'?

বৃন্দাবনে ব্রহ্মচারী ঠাকুরের আশ্রমে লেখা আছে, 'আমি যাঁহার পূজা করি সে যদি কথাই না বলবেন তবে আমি তাঁহার পূজা করিব কেন?' পড়ে মনে হয় রাধা-কৃষ্ণের যুগল-উৎসব আসলে ক্ষমতার সঙ্গে সমতার কথোপকথন, পরমাত্মা আর পরমাণুর যুগলবন্দি। আমার বাবার ছোটমামা 'রোদন-ভরা এ বসন্ত' গানটা গাইতেন কি দোলের সন্ধ্যায়? মনে পড়ে না। কিন্তু আমি জানি, দোলের দিন প্রতিটি প্রাণ অন্য প্রাণের দিকে ছুটে যেতে চায়, মিশে যেতে চায় না, এক হয়েও স্বতন্ত্র থাকতে চায়; 'আবরণবন্ধন ছিঁড়িতে চাহে' কেবল নয়, আবরণ ছিঁড়ে গেলে চায় কেউ বরণ করে নিক সাদরে।

কাটোয়ার গঙ্গায় ডুব দিয়ে মস্তকমুণ্ডন করে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন নিমাই। ওই কাটোয়াতেই এক মানুষীকে ঘরে তৈরি ছানার সন্দেশ বিক্রি করতে দেখেছি। অদ্ভুত সব নাম ছিল সন্দেশগুলোর। 'অদ্বৈত', 'নিতাই', 'হরিদাস' 'নন্দেরচাঁদ'... এই রকম সব নাম দিয়ে সন্দেশগুলি তিনি বিক্রি করতেন। হয়তো মেলায় আগত বৈষ্ণবদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জনের লক্ষ্যেই অমন নামকরণ। আমি এক বার 'পঞ্চাশ টাকায় দশটা সন্দেশ' শুনে বলেছিলাম, "পঞ্চাশ টাকায় বারোটা সন্দেশ হবে, ঠাকুমা?"

উত্তরে আমার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে তিনি বলেছিলেন, "সব ক'টা সন্দেশ নিয়ে যা। ঠাকুমা বলিস না।"

সেই হ্লাদিনী শক্তি এখনও পৃথিবীতে, না পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গিয়েছেন, জানি না। যদি পৃথিবীতেই থাকেন, তা হলে আমি এ বারের দোলে ওঁর পায়ে নয়, গালে আবির দিতে চাই।

চব্বিশে ছাব্বিশ

অনিন্দ্য মুখোপাধ্যায়

রোজই বাড়ি ফেরার সময় ভাবি, যদি পাশে একটু রোগাপাতলা কেউ বসে, বাকি পথটা একটু আরামে যেতে পারি। সুন্দরী কাউকে বাসে উঠতে দেখলেই চেপেচুপে বসি, যাতে অনেকটা জায়গা দেখায় পাশে। তবু সবাই পাশ কাটিয়ে পিছনে গিয়ে অন্য সিটে বসে পড়ে। আর এমনই বরাত যে আজ অতিশয় হৃষ্টপুষ্ট এক জন এসে বসে পড়ল আমার পাশে। এতখানিই চওড়া যে, ওঁর অর্ধেক সিটে, আর বাকি অর্ধেক ঝুলছে। কিন্তু অর্ধেকেই আমার করুণ অবস্থা।

এই শাটল বাসগুলো পুরোটাই সিটিং। দাঁড়িয়ে কেউ থাকে না। যত ক্ষণ সিট, তত ক্ষণই লোক নেয়। অফিসযাত্রীই শুধু। ভাড়া একটু বেশি। মোবাইল অ্যাপে বুক করতে হয়।

মাসখানেক হল, নিউ টাউনের এক প্রাইভেট কোম্পানিতে আমার চাকরি জুটেছে। তাই বেশ ফুরফুরে আছি। মানে প্রেমটেম পাচ্ছে আর কী। কাজটাও বেশ লাগছে। ঠিকমতোই পারছি। পঁচিশ পেরিয়ে ছাব্বিশ আমি এখন। এ বয়সে একটু-আধটু প্রেম সবারই পায়।

ঙ্খস্তুত্রঙ্কুস্ত্রদ্বত্রদ্রষ্ঠ

ঙ্খস্তুত্রঙ্কুস্ত্রদ্বত্রদ্রষ্ঠ

মেয়েদের সঙ্গে বেশি সদ্ভাব নেই, সবই মনে মনে। যেমন ধরুন, বাসে ওঠা সুন্দরী ললনাদের মনে মনে রেটিং করে তাদের মধ্যে থেকে কাউকে তিলোত্তমা গোছের একটা খেতাব দিলাম। এ বারে ধরুন তার নেমে যাওয়ার হল, আমি ও দিকে যশ চোপড়ার শেখানো সবুজ সর্ষেখেতে বসে 'পলট, পলট' করলাম। আসলে সিটে বসে, মনে মনে। কিন্তু শেষে নিজেই পলটে পল্টু। আর এই 'পলট পলট'-এর সময় আমায় কিন্তু নিজেকে মোটেই শাহরুখ মনে হয় না, একেবারে আমির! অবশ্য এটাও কল্পনায়। আমি বেশ ক্যাবলা টাইপ দেখতে। যা-ই হোক, কাউকে পল্টানো গেল না দেখে আমি কিছুই হয়নি গোছের মুখ করে 'তুম নেহি তো কোই অওর সহি' গোছের দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি!

অফিস আসার সময় বাসে এলেও ফেরার সময় এ রকম এসি শাটলে ফিরি আমি। একটু চোখ বন্ধ করে কানে একটা ইয়ারফোন গুঁজে গান শুনছিলাম আজ। বেশ লাগছিল। গানটা শেষ করে হেডফোন পকেটে রেখে নানা হিজিবিজি ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, সূর্য থাকলেও চাঁদের সৌন্দর্য নিয়ে কবিরা কত কী লিখে যান। চাঁদ বেশ শান্ত, স্নিগ্ধ। জানলা থেকে দেখি, ছাদে উঠে দেখি, রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে দেখি। যেন আমারই জন্যে। ওই জন্য কবিরা শুধু চাঁদ নিয়ে লিখে যান! সূর্যের চেয়ে কত ছোট, কিন্তু তেজ-দীপ্তিতে পিছিয়ে পড়া নেই এতটুকু! তবে হ্যাঁ, চাঁদের কলঙ্ক থাকে। কলঙ্ক শুনলেই আমার আবার কেমন কঙ্কাবতী কঙ্কাবতী মনে হয়!

এই সব ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বোধ হয়, হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি আমার পাশের আমজাদ খান কখন উঠে গেছেন, আর পাশে এসে কখন বসেছে শ্যামলা কিন্তু মিষ্টি মুখের অল্পবয়সি একটি মেয়ে। মানে এই তেইশ-চব্বিশ হবে হয়তো। একমনে মোবাইল ঘাঁটছে। আমি মনে মনে যা-ই হই না কেন, যথেষ্ট ভদ্র বাইরে। অবশ্য মনেও অভদ্র নই, কিন্তু ওকে দেখে একটা রিনরিনে অনুভূতি হল। এক অদ্ভুত ভাল লাগায় মনটা ভরে উঠল। একটা সুর বেজে উঠল কি? দূরে কোথাও?

এখানে বলে রাখি, আমি কিন্তু ওই প্রেমে-ব্যর্থ টাইপ নই। এমন একটা লোক, গোঁফটোফসুদ্ধ, নিজের মতে, যাকে দেখে কেউ কখনও প্রেমে পড়া তো দূর অস্ত, 'পলট' পর্যন্ত হয় না! আমায় কেমন দেখতে বলিনি, না? ক্লাস টুয়েলভে পড়ার সময় পাড়ার মধুদা এক বার বলেছিলেন, "সুনীল শেট্টির মতো দেখতে হয়েছিস, একেবারে গোপীকিষান!" সবাই হো হো করে হেসেছিল। তবে আমি স্পোর্টিংলি নিয়েছিলাম। যাই হোক, ফিল্মস্টারের সঙ্গে তুলনা। কম কী! মধুদা পরে কোচিং সেন্টার খুলেছিলেন। উনি খুব খুশি হলে বলতেন, "দশে বারো দিলাম।"

তা, যে কথা বলছিলাম। আমি কিন্তু বেশ দিব্যি টুপটাপ প্রেমে পড়ি। যদিও কেউই জানতে পারে না। নিজের মনে একটা কল্পনায় খেলা চলতে থাকে। মানে আলাপটাও বেশ রংচঙে ভাবে শুরু আর তার পর গল্পের গরু গাছ পেরিয়ে আকাশে।

এখানেও বেশ একটা গল্প মনে মনে ভাবছি শুরু করব, হঠাৎ কেমন খটকা লাগল। মনে হল, একে আগে দেখেছি। চিনি চিনি মনে হচ্ছে। মুখটায় কার সঙ্গে যেন মিল! কিন্তু আর এক বার যে চেয়ে দেখব তার উপায় নেই। মনে হচ্ছে কে যেন যুদ্ধের শিরস্ত্রাণ পরিয়ে রেখেছে। মাথার ওজনই বিশ কিলো। একটা মেয়ের দিকে অমন ভাবে তাকানো যায় নাকি? যথারীতি অসম্ভব একটা লজ্জা চেপে বসল।

"আরে আপনি তমালদা, না?"

চমকে পাশে ফিরতেই বলে উঠল, "চিনতে পারছেন না? আমি রিনি। আপনার কাছে অঙ্ক করতে আসতাম। মা প্রায়ই বলে আপনার কথা। আসুন না এক দিন আমাদের বাড়ি। ওহ, দেখেছেন বলাই হয়নি, আমি একটা জব পেয়েছি সেক্টর ফাইভে। আপনিও এই সময় ফেরেন? কী ভাল হল! দু'জনে এক সঙ্গে ফিরব, আর বোর হব না। অবশ্যে আপনি যদি বোর হন, তা হলে আলাদা কথা।"

আমি তাড়াতাড়ি বলে ফেললাম, "আরে না না..."

একটু জোরেই বলে ফেলেছি বোধহয়, পাশ থেকে চমকে উঠে মেয়েটি বলল, "কিছু বললেন?"

আমি হকচকিয়ে বললাম, "না না। স্যরি, ভেরি স্যরি।"

মানে বুঝলেন তো? ওপরের ঘটনাটি ঘটেইনি। রিনি বলে কেউ ছিল না। মানে পড়াইনি এ রকম কাউকে। আমার গল্পের গরু সবে গাছে উঠতে শুরু করেছিল, আর শুরুতেই ধুতিতে পা জড়িয়ে কুপোকাত! মনে মনে ভাবতে গিয়ে কথা বাইরে চলে এসেছে আমার। থিঙ্কিং অ্যালাউড!

নাহ, অন্য ভাবে ভাবতে হবে। গুণিজনরা বলে গেছেন, কোথাও না কোথাও আমার জন্য কাউকে না কাউকে তৈরি করা হয়েছে। এমনকি এটাও বলে গেছেন, কিছু যদি অন্তর থেকে চাওয়া হয়, সব ঘটনা-পরম্পরা, পরিবেশ পরিস্থিতি সেই ঘটনাটাকে সত্যি করে তোলার জন্য উঠে পড়ে লাগে। এটা আমি নই, বড় বড় মুনি-ঋষি বলে গেছেন। ওহ, বড়র কথায় মনে পড়ল, বড় বড় দেশে ছোট ছোট ভুল হয়েই থাকে। এই 'না'-টা জোরে বলে ফেলা অমনই একটা ছোট্ট ভুল।

ধুস, আমি একেবারে যা তা! এত জোরে 'না'-টা না বললেই হত। সব কেমন জট পাকিয়ে গেল! আমার প্রেমকাহিনি কোনও দিনই কি শুরু হবে না ভগবান! অবশ্য জানিও না, মেয়েটি স্বভাব-চরিত্রে কেমন! অনেক বয়ফ্রেন্ডও থাকতে পারে। কথাবার্তায় ভাল না-ও হতে পারে, বড়দের সঙ্গে মুখে মুখে তর্ক করতে পারে। বাবা-মায়ের সঙ্গে বিয়ের পর যদি বনিবনা না হয়? ওদের সামনে আমাকে কটু কথা বললে আমিও ছাড়ব না কিন্তু! রাগলে আমি বাপের কুপুত্তুর। আমার রাগ দেখেনি তো! যা নয় তা-ই বলবে, সহ্য করব না কি? এতটাই রেগে গেছি যে, গরম নিঃশ্বাস বেরোচ্ছে এ বার। উফ এ বারে বিয়ে পর্যন্ত ভেবে ফেলেছি! রঘুবীর রক্ষে করো!

জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে এ বারে নিজেই একটু ভয় পেয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম। নাহ, বুঝতে পারেনি কিছু। চুপচাপ বসে আছে, মোবাইল আর হাতে নেই। সরাসরি না তাকিয়েও বুঝতে পারলাম। আমি একটু সিঁটিয়েই বসে আছি।

ভেবে দেখলাম, এ রকম কিছু হতেই পারে না। মুখ হচ্ছে মনের আয়না। এক বার দেখলেই আমি বুঝতে পারি। খুবই সুশীল হবে। শান্ত, ভদ্র, মিষ্টভাষী। হ্যাঁ মিঠে গলা, ওই যে জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বললেন?' এটা শুনেই গলাটা বোঝা গেল। একদম সুরেলা। মারাত্মক ভাল গান গাইবে এ মেয়ে। সন্ধেয় আমি বাড়ি ফিরব আর ও গাইবে 'ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহে কিবা মৃদু বায়।' আহা, কী সুন্দর শোনাবে! এই মেরেছে, এটা কী ভাবলাম! আমি বাড়ি ফিরলাম আর ও বসে গান গাইছে! মানে আমি কি পুরুষতন্ত্র ফলাচ্ছি? বিয়ের পরই ওর চাকরি করা বন্ধ করে দিয়েছি? না না মোটেই নয়। ও নিজেই ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু ছাড়তে চাইলেই বা! আমি ছাড়তে দিলাম কেন?

আর তা ছাড়া এখন যা দিনকাল, দু'জনেই চাকরি করব বরং। দু'টিতে বেশ চালিয়ে নেব। আর তা ছাড়া ঘরে বসে রান্না বান্না করলেই বোর হবে, ঘরে অশান্তি হবে, ঝগড়াঝাঁটি অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা।

ভাবতে ভাবতেই মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়েছে, এ বারে নামবে বোধ হয়। আমার গল্প শেষ এ বারেও।

কিন্তু পিকচার আভি বাকি হ্যায় মেরে দোস্ত। এ বারে আর আমিরি না, পুরো শাহরুখি কায়দায় আস্তে করে চার পাশটা দেখে নিয়ে বললাম, 'পলট!' যে খেলার যে নিয়ম, যস্মিন দেশে যদাচার। আমিরি চালে আর হচ্ছে না। বাসটা দাঁড়িয়েছে স্টপেজে। আমি দ্বিতীয় বার মরিয়া হয়ে, 'পলট!'

দরজা খুলছে। খেয়াল হল, আমারই স্টপেজ! আরে, আমাকেও তো নামতে হবে! ধড়মড় করে উঠতেই মেয়েটি ফিরে তাকাল আমার দিকে। তার পর মেয়েটি নামছে আর আমি বন্ধ হওয়ার আগেই দরজাটা ধরার চেষ্টা করছি। হঠাৎ একটা বাইক দরজার সামনে! মেয়েটি নেমে দরজাটা বন্ধ করে বাইকটাকে যাওয়ার রাস্তা দিতেই আমি ককিয়ে উঠলাম। আমার তর্জনী দরজার ফাঁকে আটকে মট করে শব্দ! আঙুলটা গেল!

"আই অ্যাম ভেরি স্যরি। আমি একদম বুঝতে পারিনি। আসলে বাইকটা এমন এসে পড়ল সামনে! আপনার ভীষণ লেগেছে, না? কই, দেখি হাতটা... এ বাবা! আঙুল তো ভেঙে গেছে মনে হচ্ছে! বেঁকে গেল তো একদম। আমার যে কী খারাপ লাগছে! আমার জন্য আপনার এ রকম হল..."

আমার কল্পনার রিনি বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে কী সব বলে চলেছে! আমি চেঁচাতেও ভুলে গেলাম! এই প্রথম সিনেমা গল্পের বদলে আমার সামনে। বাস্তবের নায়িকা কত কী বলে চলেছে! তাও আমায়! এক বার নিজের ব্যাগ থেকে একটা সুগন্ধি অ্যান্টিসেপ্টিক বার করে লাগাল, আবার পরক্ষণেই জলের বোতল বার করে ঠান্ডা জল ঢালতে লাগল! আমি কেমন বোকার মতো ভেবলে গেছি! হাতে বেশ যন্ত্রণা হওয়ার কথা, কিন্তু আমি সে সব টের পাচ্ছি না তো!

আঙুলের দিকে তাকিয়ে দেখি ছ'টা বাজতে পাঁচ। মানে মাঝখান থেকে তলাটা সোজা, তর্জনীর মাঝখান থেকে ওপরের দিকে কেমন বাঁ দিকে বেঁকে গিয়ে অবিকল ছ'টা বাজতে পাঁচ! আমার জীবনও কি তা হলে উল্টো পথে হাঁটতে শুরু করল?

আমার ভাঙা আঙুল আজ একটু হলেও সিনেমা শুরুর গল্প দিয়েছে। এখন ভাল করে ওর মুখটা দেখলাম। না, না, তেইশ কিংবা পঁচিশ নয়, ঠিক চব্বিশই হবে। আমার মন বলছে। আমার ছাব্বিশ, ওর চব্বিশ।

হঠাৎ কেন যেন মধুদার কথা মনে পড়ল, দশে বারো!

আমি মনে মনে বললাম, 'নাঃ! দশে বারো নয়। আজকের সন্ধে, চব্বিশে ছাব্বিশ দিলাম তোমায়!'

ছবি প্রসেনজিৎ নাথ

রং-বেরঙের স্লোগান

বিধান রায়

রাজনীতিতে মানুষই সব। তাই 'মানুষই শেষ কথা বলে', 'মানুষই ইতিহাস গড়ে', 'আমাদের সঙ্গে মানুষ আছে', 'মানুষের জন্য কিছু করতে চাই' ইত্যাদি শব্দগুচ্ছ রাজনীতিতে ঘুরেফিরে আসে। যার পক্ষে যত মানুষ, সে তত শক্তিশালী। রাজনৈতিক এজেন্ডা যে ভাবেই হোক আমমানুষের কাছে পৌঁছতে হবে এবং তাদের স্বপক্ষে আনতে হবে। অতীতে পথসভা, মাঠসভা, প্রচারপুস্তিকা, মিছিল, মুদ্রণ-মাধ্যমে লোকের কাছে পৌঁছনো যেত। পরে এল বৈদ্যুতিন মাধ্যম। এখন সামাজিক মাধ্যমে মানুষকে সরাসরি ছোঁয়া যায়।

রাজনীতিতে জনচেতনায় কড়া নাড়ার বিভিন্ন পন্থা। বক্তৃতা, দেওয়ালচিত্র, গণসঙ্গীতের মতো স্লোগানও একটি শক্তিশালী পন্থা। এই মুহূর্তে কোনও সমীক্ষা রিপোর্ট ছাড়াই হয়তো বলা যায়, এ বছর এ রাজ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী শব্দগুচ্ছ 'খেলা হবে'। ছোটো বেলা থেকে 'খেলা জমে যাবে' 'খেল খতম' ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে আমরা পরিচিত। ও পার বাংলার সাংসদ শামিম ওসমান, বছরপাঁচেক আগে তাঁর বিরোধীদের কটাক্ষ করে বলেছিলেন 'খেলা হবে' কথাটি। তাঁর ব্যবহৃত এই স্লোগান এ রাজ্যের শাসক দলের এক নেতার মুখ হয়ে এসে বর্তমানে রাজনীতির ট্যাগলাইন হয়ে দাঁড়াল। অধিকাংশ দলই স্লোগানটি ব্যবহার করছে, এমনকি দেশের হেভিওয়েট রাষ্ট্রনেতারাও এ রাজ্যে এসে স্লোগানটিকে ব্যবহার করে উল্লসিত জনোচ্ছ্বাস উপভোগ করছেন। বলা ভাল, এই প্রথম একটি শব্দবন্ধ এমন একটি স্লোগান তৈরি করল, যা নিয়ে নিল প্রায় সব দল। এও বিবিধের মাঝে ঐক্য বইকি।

আসলে স্লোগান কতকগুলো আকর্ষণীয় শব্দগুচ্ছ, পুনরাবৃত্তিমূলক অভিব্যক্তি। ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। রাজনীতিকরাও রাজনৈতিক তাগিদ থেকে তাঁদের বক্তব্য নানা ভাবে মানুষের কাছে নিয়ে যেতে চান। কখনও সুদূরপ্রসারী বা তাৎক্ষণিক দাবি আদায়ের জন্য, কখনও নির্বাচন পর্বে।

এ দেশের একটি সার্থক ও জনপ্রিয় রাজনৈতিক স্লোগান হল 'বন্দে মাতরম'। ১৮৮২-তে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে ব্যবহৃত গানটি ১৮৯৬-এ কংগ্রেসের জাতীয় অধিবেশনে গাওয়া হয়। পরবর্তী কালে গানের প্রথম দুই শব্দ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বীজমন্ত্র হয়ে ওঠে। আজও একে রাজনৈতিক দলগুলি তাদের স্লোগান হিসেবে ব্যবহার করে। আর একটি জনপ্রিয় স্লোগান হল 'জয় হিন্দ'। গ্বালিয়র শহরের অধিবাসী রামচন্দ্র করকরে পরবর্তী কালে মধ্যপ্রদেশ প্রদেশ-কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন। তাঁরই লেখা একটি নাটক 'জয় হিন্দ'। পরে আজাদ হিন্দ বাহিনীর মেজর আবিদ হাসান সাফরানি 'জয় হিন্দুস্থান কি' স্লোগানটি ছোট করে 'জয় হিন্দ' চালু করেন। এই রকমই এক বিখ্যাত উর্দু কবি হাসরত মোহানি ১৯২১ সালে একটি সাড়া জাগানো স্লোগান লিখেছিলেন, 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'। বিপ্লবী ভগৎ সিংহ দীপ্ত কণ্ঠে এই স্লোগানটি ব্যবহার করেন এবং এটি পরবর্তী কালে এ দেশের কমিউনিস্ট তথা বাম দলগুলোর রাজনৈতিক স্লোগানে পরিণত হয়। এ ছাড়া পরাধীন ভারতে 'স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার', 'ইংরেজ ভারত ছাড়ো', 'সাইমন গো ব্যাক' ইত্যাদি স্লোগান জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

ভোটের স্লোগানের কথা যাঁকে দিয়ে শুরু করা যেতে পারে, তিনি দাদাঠাকুর, ওরফে শরৎচন্দ্র পণ্ডিত। তাঁর আমলে প্রচারকৌশলের রমরমা ছিল না, ভোটের ছড়া ও গান লিখে প্রচার চলত। দাদাঠাকুর এই কাজে যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। এক বার জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে তাঁরই এক স্নেহধন্য ছোলাভাজাওয়ালা কার্তিক সাহাকে দাঁড় করান। প্রচারে লিখলেন সেই বিখ্যাত ছড়া, 'ভোট দিয়ে যা/ আয় ভোটার আয়/ মাছ কুটলে মুড়ো দিব/ গাই বিয়োলে দুধ দিব/ দুধ খেতে বাটি দিব/ সুদ দিলে টাকা দিব/ ফি দিলে উকিল দিব আমার যাদুর কপালে ভোট দিয়ে যা।' এ ছাড়া কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে 'কর-পরশনে বিপরীত রীত' নামে একটি ভোটের ছড়া লিখেছিলেন 'যিনি তস্কর দলপতি দৈত্যগুরু/ যিনি বাক্যদানে আজি কল্পতরু/ ঠেলি নর্দমা কর্দমে অর্ধরাতে/ কত মর্দজনে ফিরে ফর্দ হাতে...' বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার উপনির্বাচনেও দাদাঠাকুর 'দক্ষিণ দুয়ারি উপনির্বাচন' নামে একটি ছড়া লেখেন। এ ছাড়াও 'ভোটামৃত'-এর একটি গানে দাদাঠাকুর লিখেছেন 'এবার হুইপ বেড়ে করবে হুইপ/ গ্যালপে চলেছি ভাই, করিব উইন রে/ দোহাই ভোটার যেন কোরো না রুইন রে।' তাঁর সমস্ত স্লোগানই ছিল নিজস্বতায় উজ্জ্বল, সে কারণেই কালজয়ী।

চল্লিশের দশকের শুরু থেকে সত্তরের দশকের শেষ ভাগ স্লোগানের রমরমা। এই চল্লিশের দশক নানা দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। এক দিকে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি রাজনৈতিক দল তাদের অবস্থান, বিতর্ক, অন্য দিকে বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৪১-এ অনাক্রমণ চুক্তি ভেঙে হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করলে কমিউনিস্ট পার্টি 'জনযুদ্ধ' নীতি ঘোষণা করে। অর্থাৎ রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি সমর্থন করেনি, এই যুদ্ধকে 'জনগণের যুদ্ধ' আখ্যা দিয়েছিল। তাতে ভারতের পরাধীন জনগণের কাছে ভুল বার্তা পৌঁছয়। কংগ্রেস এই সময় ইংরেজের কাছে দাবি করে, যুদ্ধে তারা সমর্থন দিতে পারে, যদি যুদ্ধের পর ভারতকে স্বাধীনতা দিয়ে দিল্লিতে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি তারা মেনে নেয়। ব্রিটেন চার্চিলের পরামর্শ মোতাবেক জানিয়ে দেয়, এ দাবি মানা সম্ভব নয়। কংগ্রেস এই সময় সত্যাগ্রহে বসে, সেখান থেকে তারা একটা সাড়াজাগানো স্লোগান দেয়, এই যুদ্ধে 'না এক ভাই, না এক পাই'। স্লোগানটি সেই সময় বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। ১৯৪২-এর ৮ অগস্ট কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গাঁধীজির 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রস্তাবকে গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার পর গাঁধীজি জোর গলায় ঘোষণা করেন 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' হয় স্বাধীনতা নয় মৃত্যু। এই স্লোগানটি মানুষের স্মৃতিতে আজও অমলিন। এই সময় সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন 'ভারতের মুক্তিসূর্য'। তিনি বলেছিলেন, 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব'। এই স্লোগান জানে না, এমন বাঙালি খুব কমই আছেন। তরুণ জনতা আলোড়িত হয়েছিল এই স্লোগানে। ১৯৪৫-এ আজাদ হিন্দ বাহিনীর বন্দি সৈনিকদের মুক্তির দাবিতে হরতাল পালিত হয়। ছাত্ররা সেখানে স্লোগান তোলে 'লাল কিল্লা কো তোড় দো/ আজাদ হিন্দ ফৌজ কো ছোড় দো'। দিল্লিতে জাতীয় সরকার গড়ার ভাবনা নেতাজিরও ছিল, তাই তাঁর 'দিল্লি চলো' স্লোগান। এই দশকেই বাংলার তেভাগা আন্দোলন শুরু হয়। সেখানে কৃষকরা 'আধি নয় তেভাগা চাই', 'বিনা রসিদে ভাগ নাই', 'পাঁচ সেরের বেশি সুদ নাই' ইত্যাদি স্লোগানের ভিত্তিতে সংগঠিত হয়েছিল। আবার স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সময় বামপন্থীরা স্লোগান দিয়েছিল 'এ আজাদি ঝুটা হ্যায়/ভুল মৎ ভুল মৎ'। পরে বহু প্রথম সারির বামপন্থী দল এই স্বাধীনতা সদর্থক বলে মেনে নিলেও মানুষ সেই স্লোগান ভোলেনি।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির এক দশকের মাথায় রাজ্যে খাদ্যসঙ্কট তীব্র হয়। মজুতদার আর কালোবাজারিদের দাপট, সঙ্গে প্রাকৃতিক বিপর্যয় এই সঙ্কটের কারণ। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৯-এর ৩১ অগস্ট খাদ্য আন্দোলন। আন্দোলনকারী জনতার উপর পুলিশ গুলি চালালে প্রায় ৮০ জন মারা যান। এই সময়কার দু'টি জনপ্রিয় স্লোগান ছিল, 'পুলিশ তুমি যতই মারো/ মাইনে তোমার একশো বারো।' আর একটি হল 'কেউ খাবে কেউ খাবে না, তা হবে না তা হবে না'। ষাটের দশকের মাঝামাঝি আবারও এই স্লোগান দু'টি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

ষাটের দশক স্লোগানের ক্ষেত্রে বৈচিত্রের দশক। চিন-ভারত যুদ্ধের আগে চু এন লাই ভারতে এলে সেই সময় দেশে স্লোগান ওঠে 'হিন্দি চিনি ভাই ভাই'। তার পর চিন-ভারত যুদ্ধ শুরু হলে রাজনীতি ক্ষেত্রেও ভাঙচুর শুরু হয়। হিমালয়ের এক বিস্তীর্ণ মানবশূন্য উচ্চভূমি কার দখলে থাকবে, তা ছাড়াও নাসের, বন্দরনায়েক, সোয়েকার্নো, চু এন লাই, নেহরু এঁদের জোটনিরপেক্ষ অবস্থান ইত্যাদি নিয়ে রাজনীতিক্ষেত্র উত্তাল। কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে তীব্র বিতর্ক এবং তার জেরে কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিখণ্ডিত হয়। তখন জ্যোতি বসুদের চিনের দালাল বলে 'দূর হঠো' স্লোগান দেওয়া হত।

এই সময় কলকাতার পথে পথে জ্যোতি বসু ও চু এন লাই-এর কুশপুতুল পোড়ানো হত। কালীঘাটে কুশপুতুলের একটা দোকানই খুলে যায়। চিন দেশে ওঠা কিছু স্লোগান তখন আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকদের আলোড়িত করেছিল, মাও জে দঙ-এর 'সদর দপ্তরে কামান দাগো', 'যুবকেরা ভোর আটটার সূর্য' অথবা লিন পিয়াও-এর 'গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা' ইত্যাদি। নকশালরাও স্বপ্ন দেখেছিল চিনই পারবে ভারতের জনতাকে সব বন্ধন থেকে মুক্ত করতে। আবার সিপিআই(এম)-এর অভ্যন্তরে বিতর্ক এবং ১৯৬৯-এ আবার ভাগ। সিপিআই(এম) ছেড়ে গিয়ে তারা স্লোগান তোলে 'চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান', 'বন্দুকের নলই শক্তির উৎস'। সেই সময় সিপিআই(এম) দুই দেশের সংহতিতে স্লোগান তুলেছিল, 'গঙ্গা যদিও মেকং নয়/ মেকং তোমায় লাল সেলাম/ গঙ্গা মেকং এক করি/ দুই জনতার মৈত্রী গড়ি'। এই দশকেই ভিয়েতনাম যুদ্ধ। কমিউনিস্টরা শ্লোগান তুলত 'তোমার নাম আমার নাম, ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম'।

কমিউনিস্ট-বিরোধীরা কটাক্ষ করত 'বলতে বলতে ভিয়েতনাম/ ভুলে গেছে বাপের নাম'।

১৯৬৫-৬৬ সালেও খাদ্যসঙ্কট তীব্র আকার নেয়। খাবার আর কেরোসিনের দাবির মিছিলে গিয়ে নুরুল ইসলাম আর আনন্দ হাইত নামে অল্পবয়সি দুই ছাত্র মারা যান। তার পর শুরু হল বিমান বসু, দীনেশ মজুমদার, সুভাষ চক্রবর্তী, শ্যামল চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যদের নেতৃত্বে উত্তাল ছাত্র আন্দোলন। সলিল চৌধুরীর লেখা কবিতার দুই ছত্র উঠে এল স্লোগান হয়ে, 'গ্রাম নগর মাঠ পাথার বন্দরে তৈরি হও/ কার ঘরে জ্বলেনি দীপ চির আঁধার তৈরি হও/ কার বাছার জোটেনি দুধ শুকনো মুখ তৈরি হও'। এই সময় আমাদের দেশের সঙ্গে আমেরিকার চুক্তি অনুযায়ী, আমেরিকা থেকে গম আমদানি করা হত, যা পি এল ৪৮০ নামে খ্যাত। তৎকালীন কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন বলেছিলেন 'হয় কম খাও নয় গম খাও'। তিনি গমের সঙ্গে আলু, কাঁচাকলা, বেগুন ইত্যাদি আনাজ খাওয়ার নিদান দিয়েছিলেন। আর এর জন্য অ-কংগ্রেসিদের তীব্র কটাক্ষের শিকার হয়েছিলেন। এই সময় একটা স্লোগান কিছুটা শালীনতার মাত্রা অতিক্রম করেছিল, সেটা হল 'বাজার থেকে বেগুন কিনে/ মনটা হল প্রফুল্ল/ ঘরে এসে দেখি/ এ তো কানা অতুল্য'। অর্থাৎ ব্যক্তি আক্রমণ আজ নতুন নয়, সেই চল্লিশের দশক থেকেই তা শুরু হয়েছে। যত দিন গেছে ততই তা বেড়েছে। ভারতের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ১৯৬৫-তে ইন্দো-পাক যুদ্ধের সময় একটা স্লোগান তুলে ধরেন 'জয় জওয়ান জয় কিষাণ'। এক দিকে যুদ্ধজয়, অন্য দিকে তীব্র খাদ্যসঙ্কট মোকাবিলা, এই দুই উদ্দেশ্যেই এই স্লোগান। এই সময় কংগ্রেসিরা কমিউনিস্টদের কটাক্ষ করে স্লোগান দিত, 'চিনের কাস্তে হাতুড়ি/ পাকিস্তানের তারা/ এর পরেও কি বলতে হবে/ দেশের শত্রু কারা?' আবার বামপন্থী ছাত্ররা দেওয়ালে লিখত, 'যখনই জনতা চায় চাকরি ও খাদ্য/ সীমান্তে বেজে ওঠে যুদ্ধের বাদ্য।' এই ষাটের দশকের শেষ ভাগে ইন্দিরা গাঁধী স্লোগান দেন 'গরিবি হঠাও'। এই স্লোগান তখনকার রাজনৈতিক জটিলতা থেকে তাঁকে কিছুটা রেহাই দিয়েছিল, কিন্তু স্লোগানটি বিরোধীরা করে দিয়েছিলেন 'গরিব হঠাও'। এতে অনেক মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছিলেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ সালে। এর সূচনা ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় থেকে। সেই সময় বাংলাদেশের সব ক্যাম্পাসে তরুণরা স্লোগান তুলত 'বাংলা ভাষার রাষ্ট্র চাই/ রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা চাই'। তারই চূড়ান্ত পরিণতিতে বাংলা ভাষার রাষ্ট্র তৈরি হয়েছিল, যেখানে ইন্দিরা গাঁধীর অবদান অপরিসীম। আর এখান থেকেই স্লোগান এল 'এশিয়ার মুক্তিসূর্য ইন্দিরা গান্ধী যুগ যুগ জিও'। এই স্লোগান তৎকালীন কংগ্রেসকর্মীদের উৎসাহিত করত। এর পরই ১৯৭২-এর নির্বাচন। সিপিআই-এর সঙ্গে ইন্দিরা-কংগ্রেসের জোট হল। সিপিআই বাদে কয়েকটি বাম দল স্লোগান দিল, 'দিল্লি

এরপর ২২ পাতায় ▶

গন্ডারের ঐতিহাসিক সমুদ্রযাত্রা: কালিকট থেকে লিসবন

(পঞ্চম শতবার্ষিকী)

ডাঃ বিশ্বময় রায়
Illinois

প্রথম পর্ব

হৈ হুল্লোড়, কোলাহল, আনন্দোল্লাসে উত্তেজিত অসংখ্য লোকের ভীড়। জনসমুদ্র বলাই সঠিক। কোলকাতার কথা মনে পড়িয়ে দিলো। কিন্তু এ তো কোলকাতা নয়। হাজার হাজার বছর আগে ফিনিসিয়ান এবং গ্রীকদের আমল থেকে ইয়োরোপের এক অন্যতম বিখ্যাত বাণিজিক কেন্দ্র এই বন্দরশহর - লিসবোয়া। ইংরেজীতে লিসবন। পৃথিবীর সব পুরণো শহরের এক অন্যতম এবং ইয়োরোপীয়ান রাজধানীদের মধ্যে এথেন্সের পর দ্বিতীয় পুরাতন রাজধানী।

মানচিত্রে খুঁজে বার করতে একটু সময় লাগে, কন্টিনেন্ট্যাল ইয়োরোপের সর্ব পশ্চিম-দক্ষিণে এ্যাটলান্টিক মহাসাগরের সৈকতে অবস্থিত এই শহর। ইদানীং পর্তুগাল পর্যটকদের খুবই জনপ্রিয় গন্তব্যস্থল হয়ে উঠেছে। কয়েক বছর আগে আমারও যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল। অবশ্য পর্তুগালের সাথে ভারতবাসীদের পরিচয় পাঁচশো বছরেরও বেশী।

আজ সকাল এবং দুপুর পর্যন্ত লাক্সারি কোচে এবং হেঁটে বন্ধুদের সাথে লিসবন ঘুরে বেড়িয়েছি। মধ্যাহ্নভোজনের পর ড্রাইভার আমাদের নামিয়ে দিল হোটেলে। প্রায় দু'টোর সময়। গ্রুপের সবাইকে নিয়ে আইটিনারিতে আজ আর কোনো প্রোগ্রাম নেই। আমরা এবার নিজেদের ইচ্ছেমত ঘুরতে পারি। যদিও অনেকেই খুবই পরিশ্রান্ত। গতকাল শিকাগো থেকে আমার যাত্রা শুরু। বিকেলে ন্যুয়ার্কে (Newark) আমাদের গ্রুপের সবার সাথে দেখা হলো। বন্ধুরা আমেরিকার বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছেন। শুভেচ্ছার বিনিময়। তারপর সন্ধ্যের ফ্লাইটে সারারাত উড়ানে চড়ে আজ খুব ভোরেই লিসবনে পৌঁছেছিলাম। ক্লান্ত হওয়া ত স্বাভাবিক। আমার কিন্তু প্ল্যান ছিল বাকি দিনটা একটি মিউজিয়াম এবং তারপর বন্দরে একটু ঘুরে আসা। লিসবনে এসে ঐতিহাসিক বন্দর দেখব না তা কি করে হয়।

সময় নষ্ট না করে একটু ফ্রেশ হয়ে নিয়ে হোটেল থেকে ট্যাক্সি ধরে আমি একাই বেরিয়ে পড়লাম। ড্রাইভারকে বললাম, চলুন "ন্যাশনাল মিউজিয়াম অব এ্যানসিয়েন্ট আর্ট"এ। প্রাসাদ থেকে রূপান্তরিত এই মিউজিয়াম দেখতে খুবই সুন্দর। বিখ্যাত শিল্পীদের চিত্রাঙ্কন এবং বিভিন্ন ধরণের প্রাচীন শিল্পকার্যের সম্ভারে সমৃদ্ধ। বিশেষতঃ একজন জার্মান শিল্পী-অ্যালব্রেক্ট ড্যুরের (Albrecht Durer) এর চিত্রাঙ্কন দেখার আশাও পূর্ণ হল।

নীচে নেমে এসে দেখি ডান দিকে আর একটি বিশিষ্ট প্রদর্শনী—পর্তুগীজদের প্রাক্তন উপনিবেশ "গোয়া" নিয়ে। মিউজিয়ামে ঢোকার সময় বাইরে ফাঁসদে ঝুলন্ত ব্যানারে সেই নিয়ে বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম। বিভিন্ন স্বর্ণালঙ্কার, গোয়ার ভারতীয় অধিবাসীদের সামাজিক জীবনযাপন ইত্যাদি নিয়ে এক অপূর্ব সুন্দর ঐতিহাসিক প্রদর্শনী। খুবই ভাল লেগেছিল। ভারতবর্ষের তিক্তমধুর ইতিহাস মনে পরিয়ে দিলো—একটু বিষাদের স্পর্শ।

বেরিয়ে এসে আবার ট্যাক্সি করে বন্দরের নিকটে নেমে গেলাম। পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে বয়ে চলেছে ট্যাগাস নদী, এখানেই মিশে যাবে এ্যাটলান্টিক মহাসাগরে। কত ইতিহাস ভাসমান এই নদী আর মহাসাগরের জলস্রোতে। হাঁটতে আরম্ভ করলাম। অস্তগামী সূর্যের সোনালি আভায় স্নাত দিগন্তহীন সমুদ্র, ঝলমল করছে সমস্ত শহর, অপূর্ব সুন্দর লাগছিল। পারিপার্শ্বিক দৃশ্য দেখতে দেখতে কখন যে বন্দরে পৌঁছে গিয়েছি বুঝতে পারি নি। ক্লান্তিতে সারাটা শরীর ভরা। কিছুক্ষণের জন্য একটি বেঞ্চে বসে পড়েছিলাম। কখন যে চোখ জুড়িয়ে এসেছিল...।

হঠাৎ শুনতে পেলাম হৈ হুল্লোড়, কোলাহল...। চোখের সামনে ভেসে উঠল একটি দিনের ছবি। পাঁচশো বছর আগের। বন্দরে এত লোকজনের ভীড়। আজ যেন সমস্ত লিসবন এসে সমবেত হয়েছে এই বন্দরে। অতি অভিনব কিছু দেখার আশায় উদগ্রীব হয়ে সবাই অপেক্ষা করছে। কি ব্যাপার। এত ভীড় কেন, একজনকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম সুদীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর সুদুর ভারতবর্ষ থেকে আজ একটি জাহাজ এসে পৌঁছুবে এই বন্দরে। বেশী দেরী নেই।

এই জাহাজের পণ্যসম্ভারের সাথে আছে এক অতি মহার্ঘ উপহার। রাজা ম্যানুয়েল (প্রথম) এর জন্য। কি উপহার? একটি গন্ডার। তাই নাকি। তার জন্য এত ভীড়, এত কৌতুহল, এত আনন্দ—যেন উৎসবের মেলা বসেছে। ধুমধাম, গিটারের সাথে গান, ড্রাম পেটানোর আওয়াজ, ছেলেমেয়েদের এদিক সেদিন ছোটাছুটি। একটু অবাক হলাম এরা কি কোনোদিন গন্ডার দেখে নি! না। গন্ডার বলে জন্তুটি দেখতে কিরকম লিসবোনিয়ানরা কেউ জানে না। হয়ত ইতিহাসে পড়েছে, কিন্তু চাক্ষুষ কেউ দেখে নি, কোথাও ছবিও দেখে নি।

ভুলে গিয়েছিলাম, প্রায় এগারশ বছর পেরিয়ে গিয়েছে, শুধু পর্তুগালেই নয় সমস্ত ইয়োরোপেও কেউ গন্ডার দেখে ি ন। সেই গন্ডার বলে জন্তুটিকে চাক্ষুষ দেখার সুযোগ হবে। তাই সমস্ত লিসবন ভেঙ্গে পড়েছে এই বন্দরে।

দিনটি ছিল ২০ মে, ১৫১৫ খ্রিষ্টাব্দ। আমিও জনস্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। হাজার হাজার লিসবোনিয়ানদের সাথে আমিও অতি উৎসাহের সাথে অপেক্ষারত ভারতবর্ষের এই গন্ডারটিকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে।

ভাবছিলাম কোথায় ভারতবর্ষ, আর কোথায় লিসবন। এত দূরের পথ নিরাপদে পাড়ি দেওয়া সতিই কি সম্ভভ? পাঁচশো বছর আগে জাহাজগুলো ছিল খুবই ছোট। ঝড়তুফান, সমুদ্রের উত্তাল উদ্দাম ঢেউ ছিনিয়ে নিতে অনেক জাহাজ। পুতুলের মত খেলা করে তারপর ভেঙ্গেচুড়ে ডুবিয়ে দিত অতল সমুদ্রের গভীরে, তার সাথে জাহাজের আর সবাইকে।

হঠাৎ জনতার কর্ণভেদী চীৎকার, দেখি জাহাজ এসে গিয়েছে। খাঁচায় পোরা গন্ডারকে নামানো হয়েছে। সমস্ত বন্দর সরগরম, তোলপাড়। সাবই ছুটছে, কে কত কাছে গিয়ে গন্ডার দেখতে পারবে। এত গোলমালে আমার নিদ্রাভঙ্গ। চোখ খুলে দেখলাম বন্দরের পাশে বেঞ্চে আমি ঠিকই বসে আছি, পাশে ট্যাগাস তখনও নিজের মনে বয়ে চলেছে। সূর্য প্রায় দিগন্ত ছুঁই ছুঁই। আকাশ রক্তিম। ধ্যানমগ্ন সমুদ্র। কিন্তু কোথায় গণ্ডার?

দ্বিতীয় পর্ব

১৫ শতাব্দীর শেষের এবং ১৬ শতাব্দীর প্রথম দিকের এই গল্প। নতুন সমুদ্রপথ, নতুন পৃথিবী আবিষ্কারের যুগ। ভূমধ্যসাগর দিয়ে পূর্বদিকে এগিয়ে তারপর স্থলপথে যেভাবে অন্যান্য ইয়োরোপীয়ানরা ভারতবর্ষে যেতো সেই সমুদ্রপথ ১৫ শতাব্দীর শেষের দিকে তুরস্কের মহাশক্তিশালী অটোমান সুলতানের আদেশে অবরুদ্ধ। পর্তুগীজদের আপ্রাণ প্রচেষ্টা চলছে এ্যাটলান্টিক এবং ভারত মহাসাগর পেরিয়ে কিভাবে ভারতবর্ষে পৌঁছনো যায়। কিন্তু ওদের জানা ছিল না কোথায় ঐ দুই মহাসাগর এসে মিশেছে। আফ্রিকার পশ্চিম সৈকত ধরে দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছুবার অনেক বছরের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পর্তুগীজরা সাফল্য লাভ করে নি।

সেই যুগান্তকারী আবিষ্কার সম্ভব হবে ১৪৮৮ খ্রিস্টাব্দে। সমুদ্রপথে প্রাচ্যের দরজা উন্মুক্ত করলেন পর্তুগীজ অভিযাত্রী বার্টোলোমো ডিয়াস (Bartolomeu Dias)। জাহাজে আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত পেরিয়ে পৌঁছুলেন ভারত মহাসাগরে। ভীষণ জড়তুফানে জাহাজ প্রায় ডুবে গিয়েছিল। মৃত্যুর হাতছানি। তারপর আফ্রিকার পূর্ব সৈকত ধরে কিছু উত্তরে গিয়েছিলেন। ভারত মহাসাগরে আরও পূর্বদিকে এগিয়ে ভারতবর্ষে যাবার ইচ্ছে ছিল তাঁর। কিন্তু শ্রান্ত ক্লান্ত ভীত নাবিকরা নারাজ। তাদের বিদ্রোহ এড়াতে ডিয়াস ফিরে এসেছিলেন (ডিসেম্বার, ১৪৮৮)। তিনিই প্রথম অবিষ্কার করলেন এ্যাটলান্টিক এবং ভারত মহাসাগর সংযুক্ত।

এবার আরও পূর্বে ভারত মহাসাগরে এগিয়ে যেতে হবে। সেই মহা অভিযাত্রার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরও কয়েক বছর।

৮ জুলাই, ১৪৯৭ খ্রিষ্টাব্দ। এ লিসবনেরই বেলেম (Belem) জাহাজঘাটি থেকে সেইদিন জাহাজ ভাসিয়েছিলেন স্বনামধন্য ভাস্কো-ডা-গামা। তারপর এ্যাটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে ইষ্টার্ণ কেপ (ডিসেম্বার ১৪৯৭), মোজাম্বিক (মার্চ, ১৪৯৮), মোম্বাসা (এপ্রিল, ১৪৯৮), মালিন্দি হয়ে ভারত মহাসাগর অতিক্রম করে ভারতবর্ষের পশ্চিম সৈকতে কালিকটে তাঁর পদার্পণ। যাত্রা আরম্ভের ১০ মাস ১২ দিন পরে—১৪ মে, ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে। ইতিহাসে দিনটি রইল স্বর্ণাক্ষরে লেখা। খ্যাতির তুঙ্গে উঠবেন ভাস্কো-ডা-গামা। যিনি দু'টি মহাসমুদ্র পেরিয়ে অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করেছিলেন।

কালিকটই হবে ভারতবর্ষে পর্তুগীজদের প্রথম উপনিবেশ। তারপর গোয়া, দমন, দিউ ইত্যাদি। শুরু হল স্পাইস ট্রেড। তারপর ধীরে ধীরে শুধু পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের প্রসারই নয়, খ্রিষ্টান ধর্মের প্রচার, ঔপনিবেশিকদের কঠোর শাসন এবং নির্লজ্জ শোষণ।

তৃতীয় পর্ব

ভারতীয় গন্ডারের গল্প বলতে গিয়ে পাঁচশো বছর আগের ভূগোল এবং ইতিহাসের রোমাঞ্চে ভেসে গিয়েছিলাম। ভাস্কো-ডা-গামা ভারতবর্ষে পদার্পণ না করলে এই গল্প সম্ভব হতো না। এবার আমাদের গন্ডারের গল্পে ফিরে আসি। একটি সাধারণ গন্ডার, যে হবে পৃথিবী বিখ্যাত, যার খ্যাতি পাঁচশো বছর পরেও কিছুই হ্রাসপ্রাপ্ত হবে না। যার স্মৃতি ইয়োরোপীয়ানদের বিশেষতঃ জার্মাণদের কাছে এখনও উজ্জ্বল-জার্মাণী এবং ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে ভ্রমণের সময় আমি নিজেই দেখেছি, শুনেছি। কৃতিত্ব দিতে হবে শিল্পী আলব্রেক্ট ড্যুরের কে।

১৫১৪ খ্রিষ্টাব্দ। ভারতবর্ষে পর্তুগীজ উপনিবেশের প্রথম গভর্ণর এবং ভাইসরয়ের পদে ভূষিত হয়ে এলেন অ্যালফন্সো-ডি-অ্যালবুকার্ক। ব্যস্ত হয়ে পড়লেন উপনিবেশ প্রসারে। একটি দ্বীপপুঞ্জের অধিকার পাওয়ার জন্য আবেদন গুজরাতের সুলতানের কাছে। পাঠালেন প্রচুর মহার্ঘ উপহার। সন্তুষ্ট হয়ে সুলতানও অ্যালবুকার্কে দিলেন অনেক উপহার যার মধ্যে ছিল অপ্রত্যাশিত অতি চমকপ্রদ একটি বিশাল গন্ডার। অবশ্যই খাঁচায় শৃঙ্খলাবদ্ধ।

এই অভাবনীয় উপহার পেয়ে আলবুকার্ক খুবই বিস্মিত, একটু বিভ্রান্ত

সব নাবিকদের নিয়ে অতল সমুদ্রে সমাধিস্থ জাহাজ। তার সাথে ডেকের উপর পোস্টের সাথে শিকল দিয়ে বাঁধা বন্ধ খাঁচায় গন্ডার। গন্ডার খুব দক্ষ সাঁতারু। শৃঙ্খলাবদ্ধ না থাকলে সাঁতার কেটে হয়তো সৈকতে পৌঁছুতে পারতো।

এরপর ১৯ পাতায় ▶

গন্ডারের ঐতিহাসিক সমুদ্রযাত্রা: কালিকট থেকে লিসবন

▶ ১৮ পাতার পর

- গন্ডার নিয়ে তিনি কি করবেন, কোথায় রাখবেন, তা নিয়ে চিন্তাভাবনা। গন্ডারটি বেশ বড় এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। সমস্যার সমাধান করতে বেশি সময় লাগে নি—এক ঢিলে দুই পাখি মারার সুযোগ এসে গেলো।

প্রথমেই উল্লেখ করেছিলাম ইয়োরোপে তখন কোন গন্ডার ছিল না। ইরোয়ীপয়ানরা শেষবারের মত গন্ডার দেখেছিল সেইসময় থেকে প্রায় ১১শ বছর আগে—৪০৪ খ্রিস্টাব্দে, রোমের কলিশিয়ামে এবং অন্যান্য অ্যাম্ফিথিয়েটারে। গ্লেডিয়েটাররা যখন অন্যান্য গ্লেডিয়েটার বা হিংস্র জন্তুদের সাথে আমৃত্যু সংগ্রামে (এক পক্ষের বা কোন সময় দুই পক্ষেরই) অংশগ্রহণ করতো। রোমানদের আমোদপ্রমোদের জন্য এবং দৈনন্দিন বাস্তব সমস্যা মন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য রোমান সম্রাটদের আর এক অন্যতম অবদান। কি ভয়ঙ্কর ছিল এই দ্বন্দ্ব। যত বেশী ভয়ঙ্কর, নির্দয়তা নৃশংসতায়, রক্তের ফোয়ারায় যত বেশী সিক্ত ভূমি তত বেশী আনন্দে তৃপ্ত রোমান দর্শকরা। সমস্ত কলিশিয়াম কেঁপে উঠত ওদের কলরবে, উন্মাদ চিৎকারে, বীভৎস আনন্দোল্লাসে। এর সমাপ্তি হবে কবে?

ইতিহাসে জানা যায় রোমে কলিশিয়ামে গ্লেডিয়েটারদের শেষ যুদ্ধ হয়েছিল পয়লা জানুয়ারী, ৪০৪ খ্রিষ্টাব্দে। তারপর ইয়োরোপে আর গন্ডার দেখা যায় নি। এই জন্তুটির অস্তিত্ব বা দেখতে কিরকম তা ইয়োরোপীয়ানদের স্মৃতিপট থেকে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

অনেক ভেবেচিন্ত অ্যালবুকার্ক স্থির করলেন পর্তুগালের রাজা ম্যানুয়েল কে এই গন্ডারটি উপহার দেবেন। একটি অভিনব উপহার পেয়ে রাজা খুবই আনন্দিত হবেন। আর এই অবাঞ্ছনীয় জন্তুটির দেখাশুনার ঝঞ্ঝাট থেকে অ্যালবুকার্ক নিষ্কৃতি পাবেন। কিন্তু কি করে পাঠানো যায়? তাঁর ভাগ্য এমনই ভাল কালিকটের পাশ দিয়ে পর্তুগালের একটি ছোট নৌবহর তখন যাচ্ছিল লিসবনে। সেই নৌবহরের একটি জাহাজে তুলে দিলেই ত হয়। কিন্তু বললেই ত হয় না। দুই টন ওজনের এই বিশাল গন্ডারটিকে জাহাজে পাঠানোও এক সমস্যা। খাদ্য সরবরাহ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সমুদ্রের ভয়ঙ্কর উথাল পাথাল থেকে ওকে রক্ষা করতে হবে। গন্ডারটি যেন জীবিতাবস্থায় লিসবনে পৌঁছুতে পারে। জানা যায় গাছের পাতা, ঘাস বা খড়কুঁটোর সরবরাহের জন্য জাহাজে বেশী জায়গা না থাকায় প্রচুর চাল নেওয়া হয়েছিল। ভাত খেতে খুবই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল এই গন্ডার। একেবারে পুরোপুরি ভারতীয়!

সব ব্যবস্থা করার পর গন্ডারের সেই ঐতিহাসিক সমুদ্রযাত্রা শুরু হলো ১৫১৫ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারীতে। বন্ধ খাঁচার ভিতর গন্ডার, পায়ে শৃঙ্খল। আর খাঁচাও শৃঙ্খলে বাঁধা লোহার একটি থামে। তা নাহলে গন্ডার এবং খাঁচা দুটোই গড়াগড়ি খাবে উদ্দাম সাগরের ঢেউয়ে। গন্ডারের নাম অজানা। ওর দেখাশোনার জন্য সঙ্গে ছিল ওসেম, এক ভারতীয় প্রতিপালক।

কালিকট থেকে লিসবন। তখনকার দিনে সবচেয়ে দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা। ৬৯০২ মাইল। জলের, খাদ্যের ব্যবস্থা করার জন্য যাবার পথে কোন না কোন বন্দরে নোঙর ত ফেলতেই হবে। এই সমুদ্রযাত্রার সম্পূর্ণ বিবরণ কারোর জানা নেই। আমরা শুধু জানি নোঙর ফেলা হয়েছিল মোজাম্বিক, ছোট্ট একটি দ্বীপ সেন্ট হেলেনা (এ্যাটলান্টিক মহাসাগরে), এবং অ্যাজোরস দ্বীপপুঞ্জের একটি দ্বীপে। সেন্ট হেলেনার নাম অনেকেই জানেন। ওয়াটার্লুর যুদ্ধে পরাজিত নেপোলিয়নকে এই দ্বীপেই ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে নির্বাসিত করা হয়। কারাগারে বন্দি হয়ে নয়, প্রাসাদের মতই একটি অট্টালিকায় তিনি ছিলেন। এখানেই তাঁর মৃত্যু হয়—৫ মে, ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে।

১২০ দিনের সমুদ্রযাত্রার পর গন্ডারকে নিয়ে জাহাজ নোঙর ফেলল লিসবনে। দিনটি আগেই উল্লেখ করেছি—২০ মে, ১৫১৫ খ্রিস্টাব্দ। জাহাজ থেকে খাঁচায় পোরা গন্ডার নামানো হল। কর্ণভেদী আনন্দের উল্লাস। সমস্ত লিসবন এসে সমবেত হয়েছিল এই বন্দরে। আমিও ওদের মধ্যে নিজেকে দেখতে পেয়েছিলাম, সেই বিবরণ আগেই দিয়েছি। মুহূর্তের মধ্যে গন্ডারটি হয়ে গিয়েছিল একটি সেলেব্রিটি। কয়েকদিনের মধ্যে সমস্ত ইয়োরোপ জানতে পারবে এই গন্ডারের আগমনবার্তা। সবাই চাক্ষুষ দেখতে চায়। কিন্তু সেই সময় তা সম্ভব ছিল না।

বহু পূর্বে, খ্রিস্টাব্দ প্রথম শতাব্দে, রোমান লেখক, দার্শনিক এবং ঐতিহাসিক প্লিনি (Pliny, the elder) এই ধরনের একটি জন্তুর (গন্ডারের) বর্ণনা দিয়েছিলেন, তাঁর বই Natural History তে। শিক্ষিত ইউরোপীয়ানরা যারা প্লিনি'র গন্ডারের বর্ণনার সাথে পরিচিত ছিলেন তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন এইরকম জন্তু শুধু কল্পনা প্রসূত। তারা এবার বিশ্বাস করলেন প্লিনি হয়তো সঠিক বর্ণনাই দিয়েছিলেন। গন্ডার কল্পনায় বিরাজমান নয়। সত্যি ছিল এবং এখনও আছে, ইয়োরোপে না হলেও অন্যান্য দেশে।

রাজা ম্যানুয়েল খুবই আনন্দিত এই অভাবনীয় উপহারটি পেয়ে। তাঁর তত্ত্বাবধানে কয়েকমাস থাকার সময় লিসবনে একটি প্রাসাদে বন্য জন্তুদের প্রদর্শনীর জন্য বিরাট একটি প্রকোষ্ঠে গন্ডারটিকে রেখেছিলেন। শুধু লিসবনে নয় সমস্ত ইয়োরোপে কৌতুহলের সীমা ছিল না। সাধারণতঃ লোকমুখে শুনেই কৌতুহল মেটাতে হতো।

পূর্বোল্লিখিত চিত্রাঙ্কন শিল্পী অ্যালব্রেক্ট ড্যুরেরও এই গন্ডারকে নিয়ে খুব কৌতূহলী ছিলেন। একজনের চিঠিতে লেখা বর্ণনা এবং আর একজন অজানা শিল্পীর গন্ডারের স্কেচ পাঠানো হল ড্যুরেরকে। সেই বর্ণনার উপর নির্ভর করে ড্যুরের গন্ডারের একটি ছবি আঁকলেন—সেই ছবি থেকে উডকাট (Woodcut), তারপর ছাপালেন অনেক ছবি। ড্যুরের "মাস্টার প্রিন্টমেকার" বলেও বিখ্যাত ছিলেন। সমস্ত ইয়োরোপে উনার আঁকা গন্ডারের ছবির প্রিন্ট ছড়িয়ে পড়েছিল। চাক্ষুষ না দেখে অন্যান্যদের বর্ণনার উপর নির্ভর করে এঁকেছিলেন, তাই ছবিতে কয়েকটি ভুল ছিল। একটি বড় ভুল গন্ডারের ত্বকের বেশ কিছু অংশ মাছের আঁশের মত আঁশ আর বর্মের মত প্লেট দিয়ে আবৃত। কিন্তু এই ত্রুটিপূর্ণ ছবিই তাঁকে আরও বিখ্যাত করে দিয়েছিল। ভুল হবে না, যদি বলি পৃথিবীতে সমস্ত গন্ডারের ছবির মধ্যে এই ছবিটি সর্ব বিখ্যাত। অজস্র বিভিন্ন স্যুভেনির সেই ছবিতে শোভিত—কি চমৎকার লাগে দেখতে।

চতুর্থ পর্ব

এদিকে রাজা ম্যানুয়েল এর অভিপ্রায়—সুদূর প্রাচ্যে নতুন উপনিবেশ স্থাপন করবেন। তার জন্য পোপের সম্মতি বাধ্যতামূলক। সেই সময় পোপই নির্ধারণ করতেন পর্তুগাল এবং স্পেনের মধ্যে কে কোনদিকে সাম্রাজ্য প্রসার করতে পারে। রাজনীতিতে বিচক্ষণ ম্যানুয়েল স্থির করলেন পোপ লিও (দশম) কে এই গন্ডারটি উপহার হিসেবে পাঠাবেন। উনি সন্তুষ্ট হলে নতুন উপনিবেশ স্থাপনের সম্মতিলাভ করা সহজ হবে।

শুরু হল গন্ডারের দ্বিতীয় সমুদ্রযাত্রা। লিসবন থেকেই, ১৫১৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বারে। এবারে গন্তব্যস্থল ইতালীর পশ্চিম সৈকতে পৌঁছে তারপর রোম। অ্যাটলান্টিক এবং ভারত মহাসাগরের তুলনায় ভূমধ্যসাগর খুবই ছোট, অত ভয়ঙ্করও নয়। দুর্যোগ, দুর্ঘটনার সম্ভাবনাও কম। সবাই প্রায় নিশ্চিত ছিল, গন্ডারটি নিরাপদেই ইতালীতে পৌঁছুবে। তারপর বেশ জাঁকজমক করে পোপকে গন্ডার উপহার দেওয়া।

প্রকৃতির অনিশ্চয়তা বোধহয় সবাই ভুলে গিয়েছিল। অথবা বিধির লিখন।

যাবার পথে ফ্রান্সের রাজা ফ্রান্সিস (প্রথম) এর অনুরোদে জাহাজ থামানো হল মার্সাই (Marsailles) এর নিকট একটি দ্বীপে (২৪ জানুয়ারী, ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দ)। জীবনে প্রথম গন্ডার দেখে ফ্রান্সিস খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। সমুদ্রযাত্রা আবার শুরু। ইতালীর উত্তর পশ্চিম সৈকতে লা স্পেজিয়ার'র (La Spezia) নিকটে জাহাজ এগিয়ে এসেছে। কিছু দক্ষিণেই রোম।

হঠাৎ ঘন কালো মেঘে আকাশ আবৃত, মেঘের কর্ণভেদী গর্জন, বিদ্যুতের ঝলকে আকাশ বিদীর্ণ, প্রচন্ড ঝড় তুফানের ঝাপটা, উত্তাম উদ্দাম সমুদ্রের তান্ডব নৃত্য। আকাশছোঁয়া ঢেউয়ের অনবরত প্রচন্ড আঘাতে জাহাজ চূড়মার। সব নাবিকদের নিয়ে অতল সমুদ্রে সমাধিস্থ জাহাজ। তার সাথে ডেকের উপর পোস্টের সাথে শিকল দিয়ে বাঁধা বন্ধ খাঁচায় গন্ডার। গন্ডার খুব দক্ষ সাঁতারু। শৃঙ্খলাবদ্ধ না থাকলে সাঁতার কেটে হয়তো সৈকতে পৌঁছুতে পারতো।

ভাগ্যের এমনই পরিহাস, যে গন্ডার সুদূর ভারতবর্ষ থেকে সর্বদীর্ঘ সমুদ্রপথ জাহাজে নিরাপদে অতিক্রম করে লিসবনে এসে পৌঁছেছিল, সে এই অনতিদীর্ঘ জলপথ পাড়ি দিতে পারল না। সৈকতের নিকটে এসেও প্রকৃতির তান্ডব নৃত্যে মৃত্যু বরণ, নিয়তির লিখন কে খন্ডাতে পারে। অতল সমুদ্রে হারিয়ে গেল আমাদের গন্ডার, কিন্তু ইতিহাসের পাতায় রয়ে গেল তার স্মৃতি।

আক্ষরিক

সৌরভ মুখোপাধ্যায়

রে, ওই দামড়া ছোঁড়াটা বুকে ও কী নকশা করেছে উল্কি কেটে?"হ্যাঁ

টিভিতে নামজাদা এক বিদেশি মডেল-ছোকরার খালি-গায়ের কসরত দেখাচ্ছে। বুকে মস্ত বাহারি ট্যাটু। লতুপিসির চোখ পড়েছে সেটার দিকে। নরম সোফার হাতলটা তাঁর বিপুল কনুইয়ের চাপে অর্ধেক দাবিয়ে, তিনি একটু বাঁ দিকে তেরছা হয়ে প্রশ্নটা আমাদের দিকে ছুড়ে দিলেন। মানে, পাঁচটি খাদ্যলোলুপ অপোগণ্ডের দিকে। আমি, সন্তু, পল্লবী, রঞ্জনা আর বিনায়ক।

চেলি-মুকুট পরা লতুপিসির যে-ছবিটি তাঁর বসার ঘরের দেয়ালে ঝোলে তা বাইশ বছর আগের। সে ছবি যে তাঁরই, এ কথা ঘোর অবিশ্বাস করবে শতকরা আটানব্বই ভাগ লোক, যত ক্ষণ না ছবিতে তাঁর পাশে কুণ্ঠিতমুখে দাঁড়ানো টোপরধারী পুরুষটি আমাদের মাইডিয়ার পল্টু-পিসে বলে শনাক্ত হন! এবং তার পর অনিবার্য ভাবে আলেখ্য-দর্শকের মুখ হাঁ হয়ে উঠবেই। কোনও বেআক্কেলে মশা সেই বর্তুল-গহ্বরের মধ্যে চু-কিতকিত খেলে বেরিয়ে আসার পর কোনও রকমে সে বলে উঠতে পারবে, "লতুপিসি... এত স্লিম ছিল!"

বর্তমানে চার ফুট এগারোর মধ্যে ছিয়াশি কিলো ধরিয়ে-নেওয়া শ্রীমতী লতিকা ঘোষাল তখন দাপটে গর্জন করে উঠবেন, "কেন রে! লতু বামনি এখন বুঝি মুটকি ধুমসি?"

এর উত্তরে যে লোক মাখন-হেসে বলতে পারবে, "বালাই ষাট লতুপিসি, আমি তো সবে অর্ধেকটা বলেছি! আসলে বলছিলাম, লতুপিসি যে স্লিম ছিল সেটা এখনও বেশ বোঝা যায়," তার বরাতে ফ্রেঞ্চ টোস্ট আর কিমার চপ বাঁধা। পিসি মেজাজি হলেও আশুতোষিণী, চর্ব্যচুষ্যের বর দিতে দক্ষিণ হস্ত উঁচিয়েই রয়েছেন।

তা, রবিবারের সন্ধেয় পিসির বসার ঘরে আমাদের একটা আড্ডা জমে। সত্যি বলতে, দমদার খ্যাঁটনের লোভেই জুটে যাই ক'জন। পল্টুপিসে এক কোণে বসে ক্রসওয়ার্ড-পাজল সলভ করেন, টিভি খোলা থাকে, আমাদের পাঁচ মক্কেলের জমায়েত তার মধ্যেই চালু। পিসি রান্নাঘর থেকে এসে মাঝে মাঝে যোগ দেন, নানাবিধ মন্তব্য করেন, নিরাপদ দূরত্ব থেকে পিসে টিপ্পনি ছাড়েন, সেই সব নিয়ে ধুন্ধুমার ও হাহাহিহিহোহো করতে করতেই সময় কাবার।

"উল্কিতে কিছু লিখেছে না কি রে?" পিসি চোখ কুঁচকে টিভির দিকে তাকিয়েই আছেন, "লেখাজোকা বলেই মনে হচ্ছে... ও কী ভাষা বল দিকি! চিনে?"

"না, চাইনিজ নয় পিসি, জাপানি! ওর গার্লফ্রেন্ড জাপানি মডেল। তাই জাপানিজে ওই নাম ট্যাটু করিয়ে রেখেছে!" সন্তু বলল।

"দেখেছ, হতভাগা ছোঁড়া! ঝোঁকের মাথায় কী বোকামি কল্লি বল তো!" পিসি চোখমুখ কুঁচকে আক্ষেপ প্রকাশ করেন, "একেবারে বুকে পাকাপাকি খোদাই করে ফেললি বাপ! ক'দিন পর যখন জাপানি ছুঁড়ি তোকে ছুড়ে ফেলে দেবে তখন হাঁপানি সামলাতে পারবি?"

"অর, ভাইসি ভার্সা! ও নিজেও ছুড়তে পারে ছুঁড়িকে!" ক্রসওয়ার্ড থেকে মুখ তোলেননি, কিন্তু বাঁকানো কর্নার কিক-এর মতো মন্তব্যটি ভাসিয়ে দিয়েছেন পল্টুপিসে।

"থামো বাপু তুমি!" ফিস্ট করে বহুদূর বল পাঠিয়ে দিলেন পিসি, "পুরুষের খ্যামতা জানা আছে!"

পিসে যথারীতি অখণ্ড মৌনে ডুবে গেলেন ফের।

লতুপিসি আবার প্রসঙ্গে ফিরলেন, "তা, হ্যাঁ রে সন্তু! এই যে এরা সব এখানে-ওখানে লাভারের নাম লিখিয়ে উল্কি ফেঁড়ায়তা, কাটান-ছাড়ান হয়ে যাওয়ার পর সে লেখাগুলোর কী হয়? পরের লাভারের চোখের সামনেই প্যাটপেটিয়ে ফুটে থাকে তো!"

রঞ্জনা হেসে ওঠে। বলে, "না না, পিসি! এগুলো পার্মানেন্ট ভাবছ না কি? সব তুলে ফেলা যায়।"

"তাই বল!" পিসি সোজা হলেন, "তবু ভাল! আমাদের সময়ে তো..."

"তোমাদের সময়েও এই রকম ট্যাটু লেখানোর চল ছিল?" বিনায়ক কিঞ্চিৎ অবাক।

ও পাশে, ক্রসওয়ার্ডের আড়াল থেকে একটা গলাখাঁকারি ভেসে এল।

পিসি সে দিকে তাকিয়ে একটা রহস্যঘন অথচ লাজুক-লাজুক চাউনি ছুড়লেন। বললেন, "কী গো! বলব?"

পল্লবী আর রঞ্জনা এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রায়! "বলো কী পিসি! তোমাদেরও এই সব গল্প আছে না কি? স্কিনে নাম-লেখানোর কেস?"

ফের গলাখাঁকারি আসে। বোধহয় গ্রিন সিগনাল!

পিসি পর্যায়ক্রমে আমাদের দিকে তাকিয়ে নেন। তার পর হাসেন ফের। আমরা দেখি, হঠাৎই যেন বয়স কমে গেছে লতুপিসির!

"তা বাপু, আমাদের কালে উল্কি-টুল্কি ছিল না। হিন্দুস্থানি মুনিষ-কাহারদের মধ্যে চোখে পড়ত, ঠাকুর-দেবতা বা নিজেদের নাম লিখিয়েছে হাতে। কিন্তু বাঙালি-ঘরে... নাহ্!" একটু থেমে পিসি বললেন, "আমাদের ছিল জ্যামিতিবাকসোর কম্পাস। আর, ব্লেড!"

আমি চমকে উঠে বললাম, "চামড়া কেটে লেখা! উরিশ্শা..."

বিনায়ক মাথা চুলকোল, "রক্তারক্তি কেস!"

"কেন, তোদের আমলে এখন কেউ হাত কেটে লাভারের নাম লেখে না বুঝি?"

"হা-ত কে-টে!" রঞ্জনা আঁতকে ওঠে, "বাপ রে! আমি ব্যাঙ কাটার ভয়ে বায়োলজি নিইনি! রক্ত দেখলেই আমি অজ্ঞান!"

"রক্ত দিয়ে লাভ লেটারও লেখে না তোদের বন্ধুবান্ধবরা কেউ?" লতুপিসি যেন বেশ অবাক।

"লাভ লেটার?" পল্লবী কুলকুলিয়ে হাসল, "এখন হোয়াটস্যাপ টেক্সটে প্রোপোজ হয়, পিসি! রিজেক্টেড হলে পুরোটা কপি-পেস্ট, রেসিপিয়েন্টের নামটা এডিট, তার পর সেন্ড টু অ্যানাদার..."

"দূর দূর! প্রেমপত্রের চার্ম জানলি না রে মুখপুড়িরা।... যাকগে, শোন! প্রেমপত্র তো হাজার কিসিমের। কল্কা-আঁকা, গোলাপের পাপড়ি-সাঁটা, সেন্ট-মাখানো, লিপস্টিক-ছাপ পর্যন্ত, কিন্তু সেরা হচ্ছে... রক্তে-লেখা লাভ লেটার! ও জিনিস অন্তত একখানা না পেলে প্রেমজীবন বৃথা, মনে করা হত আমাদের কালে!" পিসি গর্বের হাসি হাসলেন, ও প্রান্তে খবরের কাগজের আড়ালে উঁকি-দেওয়া চকচকে টাকটির দিকে ইঙ্গিত করে চোখ মটকে বললেন, "সাত-সাতখানা, হুঁ!"

সন্তু কফির কাপে সবে চুমুক দিয়েছিল। বিষম সামলে বলল, "অ্যাঁ! পিসেমশাই...! সা-ত-খানা!! অ্যানিমিয়া ধরেনি?"

পল্লবী বিস্ফারিতচক্ষে বলল, "রক্ত দিয়ে লেখা, উরিবাবা, বিশাল ঝঞ্ঝাটের কেস!"

পল্টুপিসের মৃদু কণ্ঠ ভেসে এল, "হুম! ঝঞ্ঝাট খুবই! মুরগি-কাটা কসাইয়ের সঙ্গে দোস্তি রাখতে হত... ইয়ে, মানে, হেভি লেবার দিতে হত..."

পিসি খর চোখে তাকালেন, "কী মানে দাঁড়াল কথাটার?"

"কিচ্ছু না, কিচ্ছু না... খুক্কুড়ি খুক্কুড়ি...," পিসের কাশির দমকটা বেশ সময়মতো উঠল দেখলাম।

"না মানে! এই যে কী বললে, মুরগি-কাটা না কী যেন?"

পিসের কাশি আর থামেই না!

"তার মানে তোমার সাতটা চিঠিই মুরগির রক্ত দিয়ে লেখা ছিল না কি!"

কাশি ক্রমশ প্রবলতর দেখে আমরা মীমাংসার চেষ্টা করি, "ছেড়ে দাও পিসি, কত কাল আগের কথা..."

"ছেড়ে দেব কী রে, অ্যাঁ!" রণংদেহি লতুপিসি লাফিয়ে উঠেছেন। গলায় তপ্ত তেলে লঙ্কা-ফোড়নের ঝাঁঝ, "ওই রক্ত-চিঠির পর রক্ত-চিঠি দিয়ে দিয়েই আমাকে পটিয়েছিল শয়তানটা, জানিস! না হলে ওর মতো শুঁটকো টেকোকে কে পুঁছত!"

"আহা, তখন কি টেকো ছিল পিসে!" বিনায়ক বলে, "ওই তো ছবি ঝুলছে... কেমন পুঞ্জ-পুঞ্জ বাবরি চুল... মধ্যে চেরা সিঁথি..."

"থাম তোরা!" খেঁকিয়ে উঠলেন লতুপিসি, "বিয়ের দশ বছরের মধ্যেই ওই চেরাপুঞ্জি যে সাহারা হয়ে গেছল তা জানিস? ফক্কিকারি জালি মাল, গ্যারান্টি পিরিয়ড পেরোল না..."

ক্রসওয়ার্ড-পাঁচিলের ও পাশ থেকে এক চিলতে মুখের উঁকি। ছোট্ট টিপ্পনি এল, "ইয়ে... পঁচিশ বছর আগের সেই উনপঞ্চাশ-কিলোর বালিঘড়ি-মার্কা ফিগার? যেটা ওই ফটোয় ধরা আছে? সেটা কি গ্যারান্টি পিরিয়ড পেরিয়েছিল?"

লতুপিসি প্রবলতর একটা হাঁ করে প্রত্যাঘাতে নামছিলেন, আমরা সমবেত চেষ্টায় নিরস্ত করি।

সন্তু দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে দিয়ে বক্সিং রেফারির ঢঙে ঘোষণা করে, "শান্তি শান্তি শান্তি! টাক ভার্সাস ফিগারের লড়াই আজকের ইস্যু নয়, ওটা অন্য দিন ফাইনালাইজড হবে'খন। আজকের টপিক হল রক্তে লেখা চিঠি!"

"আর, হাত কেটে নাম!" আমি পাদপূরণ করি।

"হাত কেটে নামটাও কি পিসেমশাইয়েরই কীর্তি?" পল্লবী জানতে চায়।

"উঁহুহু!" নাকমুখ বিকৃত করে পিসি ফুঁসে ওঠেন, "মুরগির রক্ত দিয়ে যে ফেরেববাজি করে, সে কাটবে হাত! চোট্টা কোথাকার!"

ফের একটা কাব্যরসে-ভেজা মন্তব্য আসে ও দিক থেকে, "আহা, আমি চোট্টম বলিয়া তুমি উত্তম না হইবে কেন লতুরানি? তোমার হাতের কাটা দাগ তো আর মুরগি-ঠেঁটের ঠোক্কর নহে। জেনুইন জিনিস, এখনও জাজ্জ্বল্যমান!"

"অ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ!" আমাদের পাঁচ জোড়া চোখ চড়কের গাছে চড়ে গেল, "ল-তু-পি-সি! হাত কেটে নাম লিখেছিল! পিসেমশাইয়ের নাম!"

"দেখি পিসি, দেখি!" প্রথমেই হামলে পড়ে রঞ্জনা আর পল্লবী।

লতুপিসি এখনও গোঁজ। শাঁখা-পলা-চুড়ি-বালায় ঢাকা বাঁ-হাতের কব্জি, সেটা ডান হাতে আড়াল করে, মুখ ফিরিয়ে আছেন। দেখাবেন না।

বিনায়ক ভুরু তুলে বলে, "আসল নামটা... পুরো? পিসের তো বিরাট নাম, মনুজেশনারায়ণ না কী যেন... উরিব্বাবা!"

"আরে ধ্যাত!" পিসে বললেন, "ওই নাম পুরো লিখতে গেলে তো উর্ধবাহুতে তাগা পরার জায়গা থেকে স্টার্ট করতে হবে হে!"

"তা হলে? আদ্যক্ষরটা বুঝি শুধু... এম?"

"আদ্যক্ষরই, তবে ডাকনামটার! পল্টুর পি। স্ট্রেট লাইনটা ব্লেডের টান, কার্ভড লাইনটা কম্পাস দিয়ে!"

"কোন ক্লাস? তখন?"

"ওর টেন," পিসে বললেন, "আমার টুয়েলভ!"

আমি লতুপিসির গোমড়া মুখের দিকে এক বার তাকিয়ে একটু আশঙ্কিত হচ্ছিলাম। আজকের জলপানিটা ফসকে না যায় এই সব শুকনো ঝামেলায়! কেবল এক কাপ কফি জুটেছে এত ক্ষণে। এ বার যদি ফস করে পিসি বলে বসেন, আজ মেজাজ খারাপ, চপ ফ্রাই কিচ্ছু ভাজতে পারবেন না...

গলাটাকে একটু আবেগ-কম্পিত করে নিয়ে বললাম, "তবে, পিসেমশাই, আপনি খুবই গর্হিত কর্ম করেছিলেন। যে লতুপিসি নিজের হাত কেটে আপনার নাম খোদাই করল, চিঠিতে মুরগির ব্লাড ইউজ করে কিন্তু তার নির্ভেজাল ইমোশনটাকেই আপনি ঠকিয়েছিলেন! প্রতারণাটা ফাঁসই যখন করলেন এত বছর বাদে, আপনার অন্তত এক্ষুনি আর্নেস্টলি অ্যাপোলোজাইজ করা উচিত..."

ও হরি! পিসে মুখ খোলার আগেই লতুপিসি দেখি খ্যাঁকখেঁকিয়ে হেসে উঠেছেন।

"ও বুড়োর আর মাফ চেয়ে কাজ নেই! অ্যাদ্দিন পর যখন নিজের ফোরটোয়েন্টি কেস লিক করেই ফেলল, তখন আমিই বা পিছিয়ে থাকি কেন? নাও বাপু, এই সব্বার সামনে আমিও আজ হালকা হই! হাত কেটে নাম লেখাটিতেও জালিয়াতি ছিল, এই জেনে রাখো, হ্যাঁ! উল্টো দিকের জালি কেসটা তো তখন জানতুম না, কিন্তু ওপরওয়ালার খেলা দ্যাখো... অজান্তেই শোধবোধ করে রেখেছিলুম, হি হি!"

এ বার পিসে খবরের কাগজ টেবিলে ফেলে শিরদাঁড়া খাড়া করে ফেলেছেন!

"ম্-মানেটা কী?"

সোফার ওপর দু'পা মুড়ে গুছিয়ে বসলেন লতুপিসি। আর, এত ক্ষণে বলয়-কঙ্কণের ভার সরিয়ে বাঁ হাতের কবজিটি উন্মুক্ত করলেন।

ঝুঁকে পড়েছি আমরা সক্কলে। একটু আবছা হয়ে এসেছে, কিন্তু ফর্সা হাতে এখনও বেশ বোঝা যায়, মণিবন্ধ থেকে ইঞ্চি-কয়েক ওপরে সুপ্রাচীন ক্ষত, ইংরেজি পি অক্ষর! পরিষ্কার।

"এ তো দেখছি জেনুইন জিনিস!" রঞ্জনা বলল।

"জেনুইন... কিন্তু ফলসও বটে!" পিসি মিটিমিটি হাসছেন।

"এ আবার কেমন হেঁয়ালি লতুরানি!" পিসেমশাইও নিজের বাঙ্কার ছেড়ে উঠে এসেছেন। হতভম্ব মুখ।

"অনেক বছর চেপে রেখেছি বাপু, ভুলেই গেছলুম এক রকম। আজ হোক

এরপর ২২ পাতায় ▶

পুরুলিয়ার গ্রামে শিব হিসেবেই পুজো পান পার্শ্বনাথ, ঋষভনাথরা

▶ ৮ পাতার পর

ছিল। ক্রোশজুড়ির আশপাশে জৈন ধর্মপন্থীরা বসবাসও করত। অস্তিত্ব রক্ষার দায়ে তারা কেউ অঞ্চল পরিত্যাগ করেছেন, কেউ আবার জৈন ধর্ম ত্যাগ করে গ্রামেই রয়ে গেছেন। কৌতূহলের বিষয় হল, সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের বারো কিমি দক্ষিণে পাবড়া-পাহাড়ীতে প্রথম তীর্থঙ্কর আদিনাথের মূর্তি আছে। পাশের ধবনী গ্রামে জৈন স্থাপত্যের স্তম্ভগুলো অযত্নে পড়ে ছিল বহু বছর। অথচ এই সব গ্রামে এখন এক ঘর জৈনও থাকেন না।

২০০১-এর সেপ্টেম্বরে একটি বাংলা দৈনিকপত্রে প্রকাশিত সংবাদের শিরোনামে অনেকেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন 'পুরাতত্ত্বের হদিস দিল এক কিশোরের স্বপ্ন'। পুরুলিয়ার গজপুরের ঘটনা। পাশের কুশটাঁড় গ্রামের বছর সতেরোর তারাপদ থাকত পিসির বাড়িতে। গুয়াই নদীর ধারে তারাপদর সঙ্গে এক সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ হয়। সেই সন্ন্যাসী তারাপদকে নদীর ধারে বসতে বলে চলে যান। কিশোরটি সম্মোহিতের মতো বসে থাকে, উঠে চলে যাবার শক্তিও হারিয়ে ফেলে। অনেক ক্ষণ পর সেই সন্ন্যাসী ফিরে এসে তারাপদকে প্রসাদ দেয় এবং গজপুরের দেবস্থানে যাবার নির্দেশ দিয়ে চলে যান।

তারাপদ রায় কুশটাঁড়ের বাড়িতে ফিরে এসে কিছু ক্ষণ মনমরা হয়ে থাকলেও সেই দিনই গজপুরের দেবস্থানে চলে যায়। জঙ্গলাকীর্ণ পাথরের ঢিবিতে কাটিয়ে দেয় সারা রাত। ছেলের উপর ঠাকুরের ভর হয়েছে এ সব ভেবে সেই ঢিবিতেই টালির চাল দিয়ে ঘর তৈরির ব্যবস্থা করলেন তারাপদর বাবা। মাটি খোঁড়াখুঁড়িতে বেরিয়ে এল একটা ছোট মূর্তি। একে একে পাওয়া গেল আরও অনেক কিছু। ৬ সেপ্টেম্বর 'মানভূম সংবাদ'-এ লেখা হল 'কুশটাঁড়ের স্বপ্নে পাওয়া খনন করা মন্দিরে ভক্তদের ভীড়।' সে সময়ে পুরুলিয়ার জেলাশাসক ছিলেন দেবপ্রসাদ জানা। তাঁর সম্পাদনায় 'অহল্যাভূমি পুরুলিয়া' একটি আকরগ্রন্থ। দেবপ্রসাদবাবুর সচেতন ও আন্তরিক উদ্যোগে রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ গজপুর থেকে উদ্ধার করল জৈন তীর্থঙ্করের মস্তকহীন দু'টি বড় দিগম্বর মূর্তি, জৈনদেবী অম্বিকার মূর্তি, কারুকার্যময় চারপল্লব যুক্ত একটি বড় ঘট এবং আটটি ছোট ঘট। এই ন'টি ঘট প্রমাণ করে এখানে অন্তত ন'টি জৈনমন্দির ছিল। এ ছাড়া তিনটি লিপিও পাওয়া গেছে এখানে। ২০০২-এ জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুরুলিয়ার 'হরিপদ সাহিত্য মন্দির'-এ ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক কর্মশালা চলাকালে জেলা সংগ্রহশালায় এগুলি দান করা হয়।

"মনে আছে, দামোদর নদের পাঞ্চেত জলাধারে তেলকুপির বেশ কিছু জৈন মন্দির ১৯৬৯ সালে জলমগ্নপ্রায় দেখেছিলাম। নীল জলরাশির মাঝে কয়েকটি মন্দির তখনও মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল।" শান্তি সিংহের এই স্মৃতিচারণে তেলকুপির মন্দিরকে 'জৈন মন্দির' বলা হলেও সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কিন্তু লিখেছেন "বিশালত্বের দিক থেকে জৈনধর্মের যেমন পাকবিড়রা, হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সেইরূপ তৈলকুপি। পশ্চিমবঙ্গে তৈলকুপির মতো এত বিশাল হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বোধহয় আর কোথাও ছিল না।" তেলকুপি বিষয়ে দু'জন দু'রকম বলছেন কেন? আসলে পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার বহু জৈন মন্দির পাল ও সেন রাজাদের আমলে বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবদেবী কিংবা হিন্দু দেবদেবীদের দ্বারা দখল হয়ে যায়। তাই এই প্রত্নমন্দিরগুলিতে মিশ্র ধর্মীয় সংস্কৃতির নিদর্শন বর্তমান। যেমন ধরাপাটের সর্পলাঞ্ছনযুক্ত দ্বিভুজ পার্শ্বনাথের মূর্তিতে পরে আরও দুটি হাত প্রস্তরখণ্ডে উৎকীর্ণ করা হয়েছে, যাতে তিনি হয়ে ওঠেন বিষ্ণুবিগ্রহ এবং হিন্দুপূজ্য। এ সব ঘটনা প্রমাণ করে ধর্মের মতি কোনও কালে স্থির ছিল না, গায়ের জোর চিরকাল তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে। মানুষ কখনও ফাঁদে পা দিয়েছে, কখনও বা 'ন্যাংটা ঠাকুর'-এর উপরেই আস্থা রেখেছে।

কৃতজ্ঞতা অমিত মুখোপাধ্যায়, দয়াময় মাহাতো, অজয় মাহাতো

নিভৃতবাসের গল্প

▶ ১৫ পাতার পর

সুভাষিণী ফোনের ও পারে ম্লান হাসল, "আমার আর কী কাজ। তাই খুঁজে খুঁজে বার করি সবাইকে।"

"ভাল করিস। যাব। গিয়ে আরও কথা হবে।"

তখন গাড়ি মা ফ্লাইওভার বেয়ে ছুটে চলেছে। রাস্তার সাদা দাগগুলো ঝড়ের গতিতে সরে সরে যাচ্ছে। এখান থেকে শহর কলকাতাকে অন্য রকম লাগে। চার পাশে দ্রুত বাড়ছে হোটেল, শপিং মল। অথচ এই রাস্তার দু'পাশ কী রকম ফাঁকা ছিল আগে।

আকাশ মেঘলা বলেই সন্ধ্যা নেমে এল তাড়াতাড়ি। শহরের আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। দিন ও রাতের সন্ধিক্ষণে একটি দু'টি করে আলো জ্বলে ওঠার মুহূর্তটি বেশ উপভোগ্য। এখনও দিনের সব আলো মুছে যায়নি। দূরের আকাশের প্রেক্ষাপটে হাইরাইজ টাওয়ারগুলোয় জ্যামিতিক বিন্যাসে আলো জ্বলে আছে জানলায় জানলায়।

বাইপাসেও গাড়ি কম। রাস্তা ফাঁকা থাকলে গাড়ি ছুটিয়ে মজা। বিশু সহজেই পৌঁছে গেল রুবি হসপিটালের সামনে। সেখান থেকে ডান দিকে টার্ন নিয়ে অল্প এগিয়ে বাই-লেনের ওপর সুভাষিণীর বাড়ি।

সুভাষিণীর বাবার বাড়ি। এক মেয়ে ও। বর মারা যাওয়ার পর বাবা-মায়ের কাছেই ফিরে এসেছিল। সেখানে থেকেই অফিস করেছে। তারা বলেছিল সুভাষিণীকে আবার বিয়ের জন্য। সায় দেয়নি মন তখন। তার পর অফিসের কাজের চাপ সামলে, অফিস আর বাড়ির ছোট্ট গণ্ডির মধ্যেই কত বছর কেটে গেল। বাবা ও মায়ের মৃত্যুর পর থেকে সুভাষিণী এত বড় বাড়িতে একাই।

আসলে খুব নীরবতার মধ্যেই নির্বিবাদে থাকতে চেয়েছে সুভাষিণী। এত দিন তো অসুবিধে হয়নি। ইদানীং মনে হচ্ছে জীবনের একাকিত্বটিই প্রকট হচ্ছে ক্রমশ। ঘরের দেওয়ালে উজ্জ্বল রঙের প্রলেপ দিয়েও সেই বিষণ্ণতা কাটানো যায়নি।

নীচের ঘরেই অপেক্ষা করছিল সুভাষিণী। শ্যামাও এসেছে। ওর ছেলে গাড়ি করে নামিয়ে দিয়ে গেছে।

সতনুকাকে পেয়ে জড়িয়ে ধরল সুভাষিণী। স্কুলে ও-ই ছিল প্রিয় বন্ধু। ইলেকট্রিক সল্ট মিশিয়ে বিলিতি আমড়া খেতে খেতে বাড়ি ফেরা। কখনও শালপাতায় আলুকাবলি। আর কত যে গল্প, শেষই হত না।

বার্ধক্যে এসে সেই দিনগুলো বড় বেশি করে মনে পড়ে। সুভাষিণী বলল, "কী সুন্দর আছিস তুই! সেই একই রকম গ্রেসফুল!"

"বলছিস?"

সুতনুকাকে সেই স্কুল থেকেই এমন কথা বলে ওরা। নিজে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখত। সে যে দিন দিন আরও রূপসী হয়ে উঠছে, তা উপভোগ করত।

আশুতোষ কলেজের মেধাবী ছাত্র সমরেশ তখনকার ছাত্র-রাজনীতির উজ্জ্বল মুখ। সুতনুকার সহপাঠী। গড়ে উঠেছিল সম্পর্ক। ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন দেখা শুরু হয়েছিল মাত্র। রাজনীতির উত্তাল সময়ে হঠাৎই নিখোঁজ হয়ে যায় সমরেশ। তখন থেকেই জীবনের লড়াই শুরু হয়ে গেল। রিয়া প্রাণ পেতে শুরু করেছিল সুতনুকার শরীরের ভিতর। একার লড়াই আরও বেড়ে গেল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সে সব সমস্যা নিজেই সামলে নিয়েছে।

সুতনুকা শ্যামাকে দেখে বলল, "কেমন আছিস, শ্যামা! কত দিন পরে দেখা!"

শ্যামাও হেসে বলল, "ভাল আছি রে। তোকে দেখে খুব ভাল লাগছে।"

"তাই! আর খবর বল, বাড়ির সবার কথা?"

"দুই ছেলেরই বিয়ে হয়ে গেছে। মেয়েরও বিয়ে দিয়েছি। নাতিনাতনি নিয়ে চলছে সংসার।"

"চমৎকার! তোর বরের খবর বললি না তো! তিনি ভাল আছেন?"

"তিনিও ভালই আছেন। এখনও ব্যবসা-কাজ সমান তালে করছেন।"

শ্যামার গায়ের রং কালো। কিন্তু দেখতে খুব সুন্দর। টানা চোখ, সুচারু নাক। যাকে বলে ব্ল্যাক বিউটি। রাস্তায় সুন্দরী অনেকই দেখা যায়, কিন্তু ব্ল্যাক বিউটি কদাচিৎ মেলে। শ্যামা এই রকমই। খুব শান্ত স্বভাবের মেয়ে, চিরদিনই কম কথা বলে।

শ্যামা অনেক আগে এসেছে। ওর ডাক্তারের কাছে রুটিন চেকআপের জন্য নাম লেখানো আছে। সুতনুকার জন্যই অপেক্ষা করছিল। কিছু ক্ষণ থেকে বেরিয়ে গেল।

সুতনুকা বললো, "রাণু আসবে বললি যে!"

সুভাষিণী বলল, "প্রথমে তো বলেছিল। তার পর ফোন করে জিজ্ঞেস করল কে কে আসছে। আমি তোর কথাই বললাম। শুনে ও বলল, ও আসতে পারছে না।"

বাইরে বৃষ্টি এল ঝেঁপে। বর্ষার বৃষ্টি বরাবরই ভাল লাগে সুতনুকার। বৃষ্টির শব্দে বেশ রোমাঞ্চ লাগে।

সুতনুকা বলল, "কার জন্মদিন বললি? ভাল করে বুঝলাম না।"

"সে বলছি। আজ থাকবি? ক'দিন এসে তো থাকতেও পারিস এখানে!"

"হ্যাঁ রে। তুইও তো পারিস আমার ওখানে গিয়েও থাকতে। খুব ভাল লাগবে।"

"কী ভাল হত, যদি আমরা সব বন্ধুরা এক সঙ্গে থাকতাম!"

"তাই কী হয়। সকলে কি আমাদের মতো একা! শ্যামার সুন্দর ভরা সংসার, শুনে খুব ভাল লাগল।"

"রাণুও খুব ভাল আছে।"

"রাণু এল না কেন বল তো?"

"বলল তো কী যেন দরকারে আটকে গেছে।"

"মোটেই না। আমার জন্যই ও এল না। ও সব মনে রেখেছে। মাধ্যমিকে আমার রেজাল্টটা ও মেনে নিতে পারেনি।"

"হতে পারে। সবাই ভেবেছিল ও-ই হায়েস্ট নম্বর পাবে। কিন্তু সে সব তো কত কাল আগের কথা!"

"এক দিন ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল এসপ্লানেডের সিগনালে। আমি গাড়ির কাচ নামিয়ে দেখি ও পাশের ট্যাক্সিতে। আমি খুব উৎসাহ নিয়ে কথা বললেও দেখলাম ওর আগ্রহ খুব কম। ওইটুকু সময়েও মুখ ঘুরিয়ে পাশের জনের সঙ্গে কথা বলা শুরু করে দিল। যাক সে সব কথা, তোর মিতিন কোথায়? আমি ওর জন্য গিফট এনেছি।"

গাড়ি থেকে গিফট-এর ঢাউস প্যাকেটটা এনে দিল বিশু।

"ও মা! তুই আবার এ সব এনেছিস কেন?"

"তুই যে বললি মিতিনের জন্মদিন!" অবাক হয় সুতনুকা।

"আমার বলাটাই ভুল হয়েছে। আয় ওপরের ঘরে।"

সিঁড়ি দিয়ে ওরা ওপরের ঘরে গেল। সুন্দর আসবাব দিয়ে সাজানো ঘর। দেওয়ালে ছবি আঁকা। সুভাষিণী বলল, "এটাই মিতিনের ঘর।"

সাত-আট বছর বয়সি একটা বাচ্চা মেয়ের সমান মাপের পুতুলের কাছে গিয়ে বলল, "এই হল মিতিন।"

সুতনুকা অবাক হল পুতুলের মুখের দিকে তাকিয়ে। চোখ পিটপিট করছে পুতুলের। মুখে হাসি। খুব দামি গোলাপি রঙের একটা ফ্রক পরিয়েছে সুভাষিণী। সুতনুকা ওর দিকে তাকাতেই সুভাষিণী বলল, "ওর যে কত জামাকাপড় আমি কিনে রেখেছি! রোজ আলাদা করে পরাই। ওকে নিয়েই আমার এখন সময় বেশ কেটে যায়। আজকের দিনেই গত বছর ওকে কিনে এনেছিলাম।"

কী বলবে কয়েক মুহূর্ত ভাবল সুতনুকা। তার পর বলল, "আমি ভাবলাম কোনও চাইল্ড তুই অ্যাডপ্ট করলি কি না!"

"কেন ছোটবেলায় আমরা পুতুল খেলতাম না? তখন ছিল ছোট পুতুল। এখন বড় বেলায় বড় পুতুল। পুতুলের বিয়ে দিতাম। বরযাত্রী আসত। সবই তো মিছিমিছি। আমি পায়েস করেছি। খেয়ে যাবি। আয়, এ ঘরে আয়।"

এই ঘরে দু'টি পূর্ণ মানুষের মতো দীর্ঘ পুতুল। একটা পুরুষ, অন্যটি স্ত্রী। সুভষিণী বলল, "মিতিনের বাবা-মা।"

দামি স্যুট আর শাড়িতে মিতিনের কল্পিত পিতার-মাতার মূর্তিগুলো বড় বড় জামাকাপড়ের দোকানে দেখা যায়। শো-কেসে সাজানো থাকে। এক বার গড়িয়াহাটের এক দোকানের সামনে এই রকম একটি স্যুট-পরা মূর্তি দেখে অনেক ক্ষণ তাকিয়েছিল।

দোকানের মালিক এসে বলেছিল, "ম্যাডাম, ভিতরে আসুন। কী চাই বলুন।"

সুভাষিণী জিজ্ঞেস করিছিল, "এই মূর্তিগুলো কোথায় পাওয়া যায়?"

দোকানদার নিউ মার্কেটের দোকানের সন্ধান দিয়েছিল। সেখান থেকে দুটি বিগ সাইজের পুতুল আর ওদের পোশাক কিনে এনেছে। নিজের একাকিত্বের ঘর পূর্ণ করতে চেয়েছে এ ভাবেই। আপন মনেই তাদের সঙ্গে কথাও বলে সুভাষিণী।

পরে গিয়ে ওদের কন্যাকেও এনেছে। নিজেই নাম দিয়েছে, মিতিন।

সুভাষিণী বলল, "মিতিন নামটা খুব মিষ্টি না! আমারই দেওয়া নাম।"

সুতনুকা ওর মুখের দিকে তাকাল। সুভাষিণী বলল, "কী দেখছিস? ভাবছিস, মাথার গোলমাল হল কি না? একেবারেই না। নিজের একাকিত্ব কাটাতেই একেবারেই নিজের টোটকা।"

অনেক গল্প হল। ভাল লাগল খুব। এ ভাবে যে কত দিন কাটানো হয়নি। ফিরে আসার সময় সুভাষিণী জিজ্ঞেস করল, "তোর মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল, দেখে মনে হচ্ছে?"

সুতনুকার অন্যমনস্কতা ভেঙে গেল, বলল, "কই না তো!"

"আমার সন্ধেটা দারুণ কাটল।"

"আমারও খুব ভাল লেগেছে।"

"তা হলে তোকে দেখে এমন লাগছে কেন?"

"আমার সঙ্গে এক দিন নিউ মার্কেটে যাবি? আমিও এমন একটি বিগ সাইজের পুতুল কিনব। শুধু পুরুষ। আমার ঘরে সাজিয়ে রাখব।"

খুব উৎসাহিত হয়ে বলল সুভাষিণী, "বেশ তো কালই চল না!"

তার পর বলল, "সমরেশের কথা তোর খুব মনে পড়ে, তাই না?"

গাড়িতে ফিরতে ফিরতে ভাবছিল সুভাষিণীর শেষ কথাটি।

হঠাৎ নিজের মনেই বলে উঠল, "না, সমরেশ নয়।"

এত দিনে সমরেশ অনেক আবছা হয়ে এসেছে। প্রয়োজন এক বিমূর্ত পুরুষের, যে পূর্ণ করবে সুতনুকাকে।

আক্ষরিক

▶ ২০ পাতার পর

তবে ঘোটালা-কনফেসের দিন! আর, তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, এখন এ সব দু'নম্বরি ফাঁস হলেই বা কী!"

"কিন্তু... কিন্তু," সন্তু ভুরু কুঁচকে বলে, "ব্লেডে-কম্পাসে চামড়া কেটে লেখা এতে দু'নম্বরি করা যায় না কি? স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, খাঁটি পি!"

"উঁহু! গোঁজামিল পি, সোনা!"

"মানে?"

লতুপিসি একটু লাজুক মুখে বললেন, "গোড়া থেকে শোন তবে। তখনও তোর পিসের সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি। ক্লাস নাইনের মাঝামাঝি। এক বিয়েবাড়িতে দেখলুম আমার বান্ধবী মণিমালার মামাতো দাদাকে। কলেজে পড়ে, হ্যান্ডসাম, স্মার্ট, গান গায়, ক্রিকেট খেলে... বুঝলি। আর যায় কোথা। ঝপ্পাস!"

"ওয়ান-সাইডেড?" পল্লবী জিগ্যেস করে।

"আবার কী! অমন কলেজ-রোমিয়োর বয়েই গেছে আমার মতো গাঁইয়া ফ্রক-পরা পুঁটিকে পাত্তা দিতে। কিন্তু আমার যে তখন ডুবজল! দিনরাত একাকার। কী-করি কী-করি! কী ভাবে দেখানো যায় যে আমি তার তরেই মরি! মণিদীপা বার বার বলছে, ওরে লতু, তুই ও চিন্তা ছাড়, ওখানে তোর নো চান্স! তত জেদ চেপে যায়। লতু বামনির জেদ! লিখে ফেললুম হাত খুঁচিয়ে, ড্রিমবয়ের নামের আদ্যক্ষর! মণিকে বললুম, বলিস তোর দাদাকে লতিকা তার নাম লিখেছে চামড়া কেটে!"

"অ্যাঁ!" পিসেমশাই তোতলাচ্ছেন উত্তেজনায়, "ত-তবে... ওই পপি... আদতে সসে-ব্যাটারই নামের আদ্যক্ষর! আমার ওপরে চালালে!"

"আরে দূর! অত ইজি নয় চাঁদ! তার নাম পি দিয়ে ছিলই না!" লতুপিসি খেলা জমিয়ে নিয়েছেন নিজের কোর্টে, পিসেমশাইকে খাবি খেতে দেখে ভারী আহ্লাদ তাঁর মুখেচোখে!

"পি দিয়ে ছিল না!" খাবি আমরাও খাচ্ছি, "তা হলে? পি লিখেছিলেন যে..."

"আরে, পুরো গল্পটা আগে শোন! হাত কেটে-ফেটেও সুবিধে হল না ও দিকে, বুঝলি। সে ছেলে ওতে ঘায়েল হওয়ার মতো জিনিসই নয়! মাঝখান থেকে আমার হাতটাই খুঁতো হয়ে রইল। বাড়িতে ঠ্যাঙানিও খেলুম। মা চুলের মুঠি ধরে নাড়তে-নাড়তে বলেছিল, 'মুখপুড়ি চর্মলিপি লিখে পাকা কাজ করে ফেললেন! কিন্তু অঙ্কটা তো মেলাতে পারলি না রে, গোবুদ্ধি! মাঝখান থেকে আলফ্যাবেটের বাকি পঁচিশটা অক্ষর বাতিল হয়ে গেল, মর তুই এ বার ওই একটামাত্তর অক্ষরের নামওয়ালা ছেলে খুঁজে-খুঁজে!'"

"কথাটা ভাববার মতোই!" সন্তু চিন্তিত ভাবে মাথা নাড়ে, "পুরনো দাগটা দেখে তো নয়া লাভার কুরুক্ষেত্র করবেই! একমাত্র... ওই পার্টিকুলার অক্ষরের ছেলে মিলে গেলে তবেই রক্ষে... হুম্!"

"কিন্তু অমন অক্ষর খুঁজে-খুঁজে কি প্রেম হয়?" পল্লবী এখনও ঘোর সন্দিহান।

"দূর, তাই হয় আবার?" লতুপিসি হেসে ওঠেন, "কপালেরও খেলা দেখ, তার কিছু দিন পরেই তোদের পিসের সঙ্গে আলাপ! ইশকুলের সরস্বতীপুজোয়। সপ্তা না-ঘুরতেই বাবুর চিঠি এল, রক্তে-লেখা চিঠি!"

ফের জোরে কেশে উঠলেন পিসেমশাই, তার পর বললেন, "কিন্তু... ওই নামের ব্যাপারটা..."

চোখ বড়-বড় করে হাসলেন লতুপিসি, "নাম দেখেই তো কপালে হাত! মনুজেশ! বাপ রে! যে অক্ষর লিখে ফেলেছি তার ঘা সদ্য কিছু দিন হল শুকিয়েছে, কিন্তু মনুজেশে তো সে-অক্ষরের বাষ্প পর্যন্ত নেই! ...সত্যি বলতে কী, পাত্র পছন্দ হয়েছে খুবই, ভেতরে ইচ্ছে ষোলো-আনা! আর, এ দিকে ইনি একটার পর একটা চিঠি পাঠিয়েই চলেছেন... ওই ইয়েতে লেখা চিঠি..."

পিসেমশাই কাশতেও ভুলে গেছেন। হাঁ করে তাকিয়ে। পিসি বলে চলেছেন, "কিন্তু কব্জির ওই একটি দগদগে অক্ষরই অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে! ভয়ে ইয়েস করতে পারছি না! তখন মণিদীপাই বাঁচাল। বলল, 'ডাকনামের খোঁজ কর না! অনেক ছেলের একাধিক ডাকনাম থাকেখোকন, বাবুয়া, টুকাই, ডিঙ্গো...! প্রব্যাবিলিটি বেড়ে যাচ্ছে কি না? বাই চান্স একটা ম্যাচ করে গেলেই বলবি, ওইটাই খুব পছন্দ, ওটার আদ্যক্ষর হাতে লিখেছি! ব্যস!'"

"দুর্দান্ত সমাধান!" বিনায়ক হাততালি দিল।

"ছাই সমাধান!" ঝাঁঝিয়ে উঠেই ফিক করে হেসে ফেললেন পিসি, "এমন কপাল, ডাকনাম একটাই বেরোল পল্টু! কিন্তু, আমি তো পি লিখে রাখিইনি!"

"তবে?"

"আমি তো ডি লিখেছিলাম হাত কেটে! ডি! সে ছেলের নাম তো ছিল দীপেন!"

"অ্যাঁ! তা হলে যে এই পি..."

"আবার ব্লেড চলল! আমি তখন মরিয়া। মিলিয়েই ছাড়ব," লতুপিসি মুখটা কেঁচকালেন, "দাঁতে দাঁত চেপে ক্যাপিটাল ডি-এর সোজা-দাঁড়িটাকে নিচের দিকে জাস্ট একটুখানি বাড়িয়ে দিলাম, ব্যস! প্রবলেম সল্‌ভড! পি!"

আমাদের বাক্যি হরে গেছে!

পিসেমশাই বিড়বিড় করে বললেন, "কুক্কুট-রুধিরে পত্রলিখন... বনাম... অক্ষরের বর্ধিতবাহু-অঙ্কন! বন্য ওল্লকন্দ ও ব্যাঘ্র-তিন্তিড়ী!... যাকগে, শঠে-শাঠ্যং হয়ে গেছে ভাই লতু, এ বার চপগুলো ভেজে ফ্যালো, অনেক ক্ষণ ধরে সাসপেন্স পুইয়ে জোর খিদে লেগেছে মাইরি!"

ছবি রৌদ্র মিত্র

রং-বেরঙের স্লোগান

▶ ১৭ পাতার পর

থেকে এল গাই/ সঙ্গে বাছুর সিপিআই'। নকশালপন্থী ছাত্রদের স্লোগান ছিল, 'ভোট ভোট করে কারা/ সাম্রাজ্যবাদের দালাল যারা'। বর্তমানে বাম-কংগ্রেস জোট নিয়েও অ-বাম, অ-কংগ্রেসিরাও সাঁইবাড়ি, মরিচঝাঁপির প্রসঙ্গ নিয়ে এসে দেওয়াল ছাপিয়ে দেয় নানা স্লোগানে। কিছু কিছু বাম-মহল থেকেও ১৯৭২ সাল, জরুরি অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে কটাক্ষ করে স্লোগানও দেওয়া হয়।

বর্তমানে স্লোগান পাল্টেছে। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে, তা মূল ধারার রাজনীতিতে চলে আসছে। দাবি আদায়ের লড়াইকে বর্তমানে নাগরিক সমাজ অনেক ক্ষেত্রে রাজনীতিকদের হাতে ছাড়ছে না। বরং নাগরিক সমাজের নানাবিধ আন্দোলনে বা ছাত্র বা পেশাগত কোনও সংগঠনের স্বতন্ত্র আন্দোলনে রাজনৈতিক দলগুলো প্রবেশ করছে। সে ক্ষেত্রে স্লোগানও রাজনীতি-নিরপেক্ষ থাকছে না। যেমন ২০১৪-র ১৩ সেপ্টেম্বর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানি কেন্দ্র করে তীব্র ছাত্র আন্দোলন আমরা দেখলাম। শুরু হল 'হোক কলরব'। হাততালি দিয়ে দিয়ে স্লোগানটি বেশ নজর কেড়েছিল। বাংলাদেশের শায়ান চৌধুরী অর্ণব-এর একটি গানের অ্যালবামের একটি গানের প্রথম দু'টি শব্দ নিয়ে গড়া এই স্লোগানটি মানুষের সমর্থনও আদায় করেছিল কিছুটা। এই সময়ের পর পরই আর একটি ঘটনা। কেরলের কোঝিকোড়ে প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমে গেরুয়া হানা। তার প্রতিবাদে যাদবপুর থানার সামনে 'হোক চুম্বন'। স্লোগান উঠল 'আমার শরীর আমার মন/ দূর হোক রাজশাসন'। পথচলতি মানুষ 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'তে খানিকটা বিমূঢ়ই হয়েছিল, তাই পথেই ভুলে এসেছিল এই স্লোগান। সম্প্রতি এক বাম ছাত্র সংগঠনের পঞ্চাশ বছর উপলক্ষে একটি শহরে শোভাযাত্রায় চোখে পড়ল একটি স্লোগান 'জুনিয়ার মজদুর এক হও'। স্লোগানটি মার্কস-এঙ্গেলস-এর কমিউনিস্ট ইস্তেহারের শেষ লাইন 'দুনিয়ার মজদুর এক হও'-এর ধ্বনিসাম্যে গৃহীত, কিন্তু ছাত্রনেতাদের কাছ থেকে ব্যাখ্যা পেলাম না, ছাত্ররা কবে মজদুর হল? ছাত্রদের কারা শোষণ করে, তার ধরনটাই বা কেমন, এর যথাযথ ব্যাখ্যা না দিয়ে এই সব খুদে বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধিত্বকারী ছাত্র সংগঠন কোথাও অজান্তে মজদুরদের খাটো করে ফেলছেন না তো?

প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের একটা গানে ছিল, 'হাট মিটিঙে চোঙা ফুঁকেছি, গেট মিটিঙে গলা ভেঙেছি চিনছি শহর গ্রাম/ স্লোগান দিতে গিয়ে আমি সবার সাথে আমার দাবি প্রকাশ্যে তুললাম।' স্লোগানে জড়িয়ে থাকে বৃহত্তর জনগণের ভাবাবেগ। দেখা গেছে কালোত্তীর্ণ হয়েছে সেই সব স্লোগান, যেখানে মানুষ নিংড়ে দিয়েছে তার আবেগকে। নির্বাচন-পর্বের স্লোগান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্বাচনের পরই হারিয়ে যাচ্ছে। এক সময়ে গ্রামগঞ্জে 'পদধ্বনি', 'মা মাটি মানুষ' ইত্যাদি যাত্রাপালা বামেদের জমি আন্দোলনে সাহায্য করেছিল এবং বামেদের এক সময়ের স্লোগান 'লাঙল যার জমি তার' বা 'লড়াই লড়াই লড়াই চাই/ লড়াই করে বাঁচতে চাই' ইত্যাদিকে জনমানসে আকর্ষণীয় করে তুলতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু পরে সেই জমি আন্দোলনে সরাসরি পালাকার ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের ওই যাত্রাপালার নামটি তৃণমূল কংগ্রেস তাদের মাস্টারপিস স্লোগান করে নিলেন, 'মা মাটি মানুষ'। এর সঙ্গে 'বদলা নয় বদল চাই' স্লোগানটিও জনপ্রিয় হয়ে রাজ্যে পটপরিবর্তনে সহায়ক হয়েছিল।

হালফিলে হিন্দি অনুকরণে বিভিন্ন স্লোগান সমর্থক মহলে আলোড়ন তুললেও জনমনে প্রভাব ফেলছে না। 'গোলি মারো...' স্লোগান রীতিমতো আতঙ্কজনক। বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে।

এ বছর করোনা-জনিত কারণে হুগলির তারকেশ্বরে ভক্তবৃন্দের সমাগম হয়নি। তার আগের বছর শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার শেওড়াফুলি থেকে তারকেশ্বর যাওয়ার ১২ নং রোডে দাঁড়িয়ে ছিলাম। পুণ্যার্থীরা যাবেন বাবার মাথায় জল ঢালতে। 'ব্যোম ব্যোম ভোলে ব্যোম', 'ভোলে বাবা পার করেগা' এই সব ধর্মীয় স্লোগান দিতে দিতেই এত দিন যেতেন ভক্তবৃন্দ। সে বছর সংযোজন 'জয় শ্রীরাম'। হাতে জাতীয় পতাকা। ধর্মীয় ক্ষেত্রে আপত্তির কিছু তো থাকে না। কোনও রাজনৈতিক দল যদি এই ধ্বনিকে তার রাজনীতির স্লোগান করে তাতেও কারও আপত্তির কিছু নেই, আপত্তি তখনই থাকবে সরল ভক্তিবিধি যদি রাষ্ট্রবিধিতে পরিণত হয়, এক অংশের বিশ্বাস প্রকাশের ধ্বনিসমষ্টি যদি মুক্তকণ্ঠকে কোথাও কোনও ভাবে আঘাত করে। আর একটু অন্য ভাবে বিষয়টিকে যদি আমরা দেখি, তা হলে দেখব, এই ধর্মীয় স্লোগানটিকে স্থান-কাল-পাত্র না ভেবে আকছার ব্যবহার করা হচ্ছে। গত ২৩ জানুয়ারি নেতাজির ১২৫তম জন্মদিবস উপলক্ষে কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের একটি অনুষ্ঠানে খোদ প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভাষণ দিতে যাবেন, দর্শকাসন থেকে ভেসে এল 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি। মুখ্যমন্ত্রী অসম্মানিত বোধ করলেন। ক্ষোভ প্রকাশও করলেন। এ ঘটনা আগেও ওঁর সঙ্গে ঘটেছে। সুদূর ভবিষ্যতে এই স্লোগানটির ধর্মীয় বা রাজনৈতিক গুরুত্ব থাকুক বা না থাকুক, জনচেতনায় এটা একটা অতিকথন বা অতিসত্যের নির্মাণ করতে পারে। ভবিষ্যতের মানুষ তো কার্য-কারণ সম্বন্ধ বুঝবে না। তারা জানবেও না যে, রামের নামে জয়ধ্বনি ছিল আসলে বিরোধী স্লোগান। তারা ভাববে 'জয় শ্রীরাম' এমন একটি স্লোগান, যা শুনলে আমাদের রাজ্যের এক মুখ্যমন্ত্রী রেগে যেতেন। মানুষ আর বিচার করতে যাবে না, কোন পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী রেগে গেছিলেন। যেমন রাজনীতিক অতুল্য ঘোষ 'কানা অতুল্য' পরিচিতি পেলেন। আমরা তাঁর দৃষ্টিহীনতা নিয়ে স্লোগান তুললাম অথচ আমরা জানলাম না এর পিছনের মর্মস্পর্শী ইতিহাসকে। ১৯৪২-এর অগস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়ে অন্যান্য সহকর্মীর মতো তাঁকেও জেলে যেতে হয়। মেদিনীপুর জেলের মধ্যে অনশন বিক্ষোভে বাকিদের সঙ্গে তিনিও শামিল হন। ইংরেজ কারা-আধিকারিকের বেয়নেটের খোঁচায় তিনি একটি চোখ হারান। অনেক চিকিৎসাতেও তাঁর চোখ তিনি ফিরে পাননি। আসলে নানাবিধ কুৎসা ছড়িয়ে ব্যক্তিমানুষকে আমমানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলে জনমানসে কোনও কোনও তকমা স্লোগানের আকারেও গেঁথে দেওয়া যায়। যেমন আরএসপি নেতা তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী অতুল্য ঘোষের বাঁকুড়ার দেওলাগড়ের এক ছোট বাড়িকে কল্পনার রং মিশিয়ে তাকে রাজপ্রাসাদ, পাশে প্রমোদ উদ্যান, সেখানে অবস্থিত সুইমিং পুলে বঙ্গেশ্বর ফুর্তি করেন ইত্যাদি প্রচার করেছিলেন। পরবর্তী কালে এই ঘটনা মিথ্যা প্রমাণিত হলে প্রকাশ্যে শ্রীচক্রবর্তী দুঃখপ্রকাশ করেন, কিন্তু তত দিনে কিছু মানুষের চেতনায় এই ভুল স্থায়ী আসন লাভ করে ফেলেছে, সঙ্গে যোগ হয়ে গেছে সহযোদ্ধা প্রফুল্ল সেনকে যুক্ত করে আর একটি আপত্তিকর স্লোগান 'আরামবাগের হারামশালায় কানা ব্যাটা অতুল্য/ অজয় নদীর (অজয় মুখার্জি) ভীষণ স্রোতে ভেসে গেল প্রফুল্ল'। একই ভাবে এ রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সম্পর্কে প্রকাশ্যে একটা অভিযোগ করা হয়, তিনি নাকি নন্দন চত্বরে সান্ধ্যকালীন আড্ডায় মহিলা-পরিবৃত হয়ে নিয়মিত মদ্যপান করেন, এই অভিযোগের পরে অনেক দিন কেটে গেছে। সময় জানে, কালি ছেটানো সহজ কিন্তু সে দাগ তোলা কষ্টকর। সাম্প্রতিক সময়ে অবশ্য শাসক দলের এক সাংসদ এই অবমাননাকর অভিযোগের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তখনই মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নামে স্লোগান তোলা হয়েছিল 'রক্তখেকো হায়না', নেপথ্যে আছে সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের আন্দোলন। সেই সময়কার বামেদের স্লোগান ছিল 'কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ'। স্লোগানটিকে মানুষ সদর্থক কী নঞর্থক দৃষ্টিতে দেখেছে, তা ভবিষ্যৎ বলবে। কিন্তু এর সঙ্গেও যুক্ত হয়েছে অতিরঞ্জিত সত্য। যেমন, কোনও কোনও অংশ থেকে প্রচার করা হয়, শিল্পের নামে প্রমোটিং হবে, বেছে বেছে বিশেষ একটা সম্প্রদায়ের জমি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে বা হাইটেনশন তার বাড়ির পাশ দিয়ে গেলে বা বসবাসযোগ্য অঞ্চলের পাশে গ্রিড স্টেশন হলে মানুষ নানা রকম রোগের শিকার হবে ইত্যাদি। একটা স্লোগান প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়ল কি না সেটা বড় কথা নয়, রাজ্যের শিল্পসম্ভাবনা প্রশ্নচিহ্নের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল, এ কথা দ্বিধাহীন সত্যি। এমন উদাহরণ অজস্র। বোফর্স মামলার সময় একটা স্লোগান দেশ মাতিয়েছিল 'গলি গলি মে শোর হ্যায়/ রাজীব গাঁধী চোর হ্যায়'। অর্থাৎ স্লোগান যেমন এক দিকে জনমত সংগঠনে সহায়ক হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে তেমনই ভিত্তিহীন অতিকথন জনচেতনায় ভুলের পলি সঞ্চয় করেছে, এ কথাও অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই।

Nobo Barsher Notun Chitthi

Shubho Nobo Barsho

NABC Global Committee wishes everyone a very happy and prosperous New Year and welcomes you to the first ever NABC Global Banga Sammelan, a one of a kind 3-day long musical, cultural and literary virtual extravaganza scheduled for July 2 through July 4, 2021.

Kinnari Gatha

The Bengal Renaissance created a space in Bengali theater for women actors to represent female characters but for these pioneers it was tough challenge. Many of them came from red-light areas. Without the right background or great environment to excel these outstanding artists fought stigma, overcame hurdles to outshine on Bengal's stage, film and records in the early 20th Century.

Kinnari Gatha will showcase the story of their struggles, brave lives, star crossed loves and their triumphs on stage. Dance performances by Indrani Datta, and Avirup Sengupta and his group, narration by Satinath Mukhopadhyay, voice and songs by Riddhi Bandyopadhyay and Dr. Devajit Bandyopadhyay in this presentation will surely take you on an unforgettable emotional journey.

Maatir Gaan Praaner Shur

Wander through the streets of Bengal, sit under the palm fronds and experience Rabindranath the minstrel. "*Sahajiya Rabi*" will transport you to Shantiniketan as you rediscover Kabi Guru in his own realm, through songs that connect your soul to your roots. Directed by Antara Das with poignant performances by Parvathy Baul, Kartick Das Baul, Manoj Murali, and Adity Gupta this program is a soul travel that you don't want to miss.

Rock Pagol Mon

Cactus, the eponymous Bangla band, grew in the dessert of the Bangla Band scene in the 90s. With experimentations like folk rock and influences of funk rock in Bengali songs they shook the Bengali music scene. Their songs like *Mon* and *Halud Pakhi* became hugely popular among the youth.

But they were not the first. There were those like Mohiner Ghoraguli who came before them to create this path breaking genre as the first Bangla band, and of course, those that have followed since. Cactus will travel through time to trace the history of Bangla Band. Sidhu (Siddhartha Sankar Ray), Pota (Abhijit Barman) and their team will rock you with some of the most famous compositions in the genre. So don't forget to tune in to your favorite numbers!

See page 24 for more

BIGGEST INTERNATIONAL BENGALI CONFERENCE AND NETWORK

REGISTER FOR NABC GLOBAL

www.nabcglobal.org

NABC GLOBAL is an exceptional international event for the global Bengalis living across the world. It will be a unique and immersive experience for all visitors attending world wide.

Sa Re Ga MA Pa 'er Shure Shure

Stars of Sa Re Ga Ma... Soumen Nandi, Chandrika Bhattacharya, Raktim Chowdhury, Shalini Mukherjee, Mayuri Saha, Niharika Nath come together to light up the virtual stage. They will present a modern rendition on some of the everlasting Golden hits of Bengali music, or *Swarna Juger Gaan*. Be ready to be dazzled by the sensational voices and their sheer talent as they reimagine these all-time hits.

Kon Bhashaye Bhalobasha

Music transcends language. Many of our famous Bengali composers who have traversed easily from Bengali to Hindi music and back have created many a jewel in both languages. Sometimes they have applied the same tune in two different situations in the two different languages. Like how a Hemanta Mukherjee classic " Olir kotha shune bokul hashe" transformed into "Na jao saian churake baian" creating a very different mood and feeling. Surojit O Bondhura, Anwesha Dutta Gupta and Pranjal Bakshi will explore this fascinating concept with their mellifluous voice and informal exposition, highlighting the inimitable genius of these renowned Bengali music directors.

Rangiye Diye Jao

Let the resplendent "Colors of Bengal" seep into your soul, with Shwapnil Shojib's multi-facetted presentation. Relive the struggles of the Bhasha Andolon through *Ekusher Gaan.* Journey through tranquil Bengal and feel the soul of and soil of Bangla with *Robi Bauler Gaan* or sway to the tunes of *Tagore in Bollywood.* With Mium Khould Hossain, (Miss World Bangladesh - 1st Runner Up) joining in for a special presentation you are surely in for a treat

NABC GLOBAL CONFERENCE

NABC 2021 Global Virtual Conference | info@nabc2021global.org

www.nabcglobal.org